সপ্তপদী

ভূমিকা

তেরশো ছাপ্পান্ন সালে পূজার আনন্দবাজারে সপ্তপদী প্রকাশিত হয়েছিল। আমার সাহিত্য-কর্মের রীতি অনুযায়ী ফেলে রেখেছিলাম নূতন ক'রে আবার লিখে বা আবশ্যকীয় মার্জনা ক'রে সংশোধন ক'রে বই হিসেবে বের করব। বিগত ১৫।১৬ বৎসর ধ'রে 'কবি'র সময় থেকে এই রীতি আমার নিয়ম ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার জীবনে ও শিক্ষায় এ শক্তি নেই আমি জানি যে, একবার লিখেই কোনো রচনাকে—নিখুঁত দূরের কথা, আমার সাধ্যমত নিখুঁত করতে পারি। কিন্তু সপ্তপদীর সময়ে ঘটনার জটিলতায় তা সম্ভবপর হয়নি। যেমনটি ছিল তেমনটিই ছেপে বইয়ের আকারে বের হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংশোধন ও মার্জনা করব, কিন্তু তা-ও সম্ভবপর হয়নি বইখানির চাহিদার জন্য। ছ-বৎসরে আটটি সংস্করণ হয়েছে। প্রকাশকেরা বিলম্ব করতে চাননি, আমাকেও সুযোগ দেননি। এবার জোর ক'রে সুযোগ নিয়ে মোটামুটি সংশোধন ও মার্জনা করলাম। তাও সম্পূর্ণ হ'ল না। সংসারে অসহিষ্ণু উদ্‌গ্রীব মানুষের তাগিদে ভারতের জগন্নাথকেও অসম্পূর্ণ থাকতে হয়েছে। হয়তো জগন্নাথকে রূপ দেবার ক্ষমতার দৈন্য মানুষ ওই কাহিনী দিয়ে ঢেকেছে। আমার এ উক্তির মধ্যেও আমার অজ্ঞাতমনের সেই ভানই হয়তো প্রকাশ পেল। সে দৈন্য সবার কাছে স্বীকার করে তাঁদের কাছে হাত জোড় করাই ভালো।

পরিশেষে সপ্তপদী রচনার ইতিহাস বা এই কাহিনীর আসল সত্য নিয়ে একটি নিবন্ধ যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেটিও পরিশিষ্টে যোগ করে দিলাম। মূল নিবন্ধে কৃষ্ণেন্দুর কথাই আছে। রিনার চরিত্র-ও ঠিক কাল্পনিক নয়। সামান্য দেখা কয়েকবার কয়েকটা ঝলক মাত্র। সেটুকু সপ্তপদীর কথা বলবার সময় বলা উচিত বিবেচনায় যোগ করে দিলাম।

এক

ছ-ফুট লম্বা একটি মানুষ। হয়তো ইঞ্চি দুয়েক বেশীই হবে। দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মনে হয় দেহ যেন কিছু শীর্ণ, কিন্তু দুর্বল বা রোগজীর্ণ নয়। কালো রঙ, বাঙলাদেশের কালো রঙ; মাজা কালো। প্রশস্ত ললাট, লম্বাটে মুখখানির মধ্যে বড়ো বড়ো দুটি বিষণ্ণদৃষ্টি চোখ। বিষণ্ণতা ছাড়াও কিছু আছে, যা দেখে মনে হয়, লোকটির মন বাইরে থাকলে অনেক দূরে আছে, ভিতরে থাকলে অন্তরের গভীরতম গভীরে মগ্ন।

পাগলা পাদরী। এই নামেই ব্যক্তিটি পরিচিত এ-অঞ্চলে। অঞ্চলের লোকের দোষ নেই, এর চেয়ে ভালোভাবে লোকটির স্বরূপ ব্যক্ত করা বোধ হয় যায় না। পরনে পাদরীর পোষাক, কিন্তু সে-পোষাক গেরুয়ায় ছোপানো, যা ভারতবর্ষের বৈরাগ্য-ধর্মের চিরন্তন প্রতীক। এ-অঞ্চলের কোনো গির্জার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নন। কোনো ধর্মও প্রচার করেন না। শুধু চিকিৎসা করে বেড়ান। পাগলা পাদরী খুব ভালো ডাক্তার। বাইসিক্লে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে রোগী খুঁজে বেড়ান। পথের দু-পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কী মহাশয়গণ, কেমন আছ গো সব? ভালো তো?' সঙ্গে সঙ্গে মুখভরা মিষ্টি হাসি উপচে পড়ে।

'হ্যাঁ বাবা, ভালো আছি।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ভালো। ভালো থাকো। মানুষ ভালো থাকলেই ভগবান ভালো থাকেন গো। জয় ভগবান!' বলেই এগুতে থাকেন। লম্বা মানুষের পা-দুখানাই বেশী লম্বা; কথা বলবার সময় বাইসিক্ল থেকে নামেন না—পা-দুখানা প্যাডেল থেকে নামিয়ে দেন মাটির উপর; চলবার সময় মাটি তুলে প্যাডেলে রেখে একটু ঝোঁক দিয়ে চাপ দেন—চলতে থাকে বাইসিক্ল। যে-কোনো লোকের বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে সে পাগলা পাদরীর প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়েই থাকে। কতক্ষণে কখন শোনা যাবে বাইসিক্লের ঘণ্টা, কখন দেখা যাবে সাইকেলের উপর গেরুয়া পোশাক-পরা পাদরীকে। দেখলেই হাত তুলে আগে থেকেই বলে, 'বাবাসাহেব!'

ছ-ফুট লম্বা মানুষটি বাইসিক্ল থেকে মাটির উপর পা নামিয়ে দেন। নামতে হয় না। 'কী খবর? কার কী হল?'

'জ্বর।'

'কার?'

'আমার ছেলের।'

'চলো; দেখি কি হইছে। অবটা কেমন, বাঁকা না সোজা? কি মনে লাগছে বল দেখি?'

রোগী দেখেন, দেখেশুনে বাইসিক্লের পিছনে বাঁধা ওষুধের বাক্স থেকে ওষুধ দেন। কিংবা বলেন, 'আমার ওখানে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এসো।' না হয় বলেন—'ইটা বাবু দোকান থেকে আনতে হবেক। আমার ভাঁড়ারে নাই।' লিখে দেন কাগজে।

বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে যে-রাস্তাটা—পুরীর পথ বলে খ্যাত—বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে

মেদিনীপুর হয়ে চলে গেছে সমুদ্রতট পর্যন্ত, যার সঙ্গে এদিক-ওদিক থেকে কয়েকটা রাস্তাই মিশেছে, তারই পারে তাঁর মিশন ; না, মিশন নয়—আশ্রম।

শালবন আর গেরুয়া মাটির দেশ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়িয়া নদী। শীলাবতী-শিলাবতী-দারকেশ্বর, শীলাই-শিলাই-দারকা। মধ্যে মধ্যে লালচে পাথর, নুড়ি ছড়ানো অনুর্বর প্রান্তর খানিকটা। এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি একটা ঢাল নামার মতো নেমে ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আবার এরই দু-ধারে বাঙলার কোমল ভূমির প্রসার। সেখানে জনসমৃদ্ধ গ্রাম, শস্যক্ষেত্র।

উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য-ভূমের শেষ উড়িষ্যা ও বিহারের প্রান্তভাগ থেকে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ফালির মতো ছড়িয়ে পড়ে শেষ হয়েছে ক্রমশ। মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলগুলি ইতিহাস-বিখ্যাত। পাথুরে কাঁকুরে এই আঁকাবাঁকা শালজঙ্গল-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে গ্রামগুলি, সেগুলিতে প্রাচীন আমলের সেই মানুষদের বংশধরেরা বাস করে। বাউড়ি, বাগ্দী, মেটে, মাল, খয়রা, সাঁওতাল। এদেরই মধ্যে সামন্তযুগে প্রধান হয়ে বসেছিল উত্তর ভারতের ছত্রীরা। সিংহ, রায় প্রভৃতিরা। কয়েকখানা গ্রামের পরে পরে এমনই এক-একটি পরিবার আজ এক-একটি বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। সেসেই আছে মামলা-মকদ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী। ঘোর কালো রঙের শীর্ণকায় অস্থাবশীর্ণ অর্ধনগ্ন মূক মানুষগুলির মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘাকৃতি উগ্র প্রকৃতির মানুষগুলি বিচিত্রভাবে মিশে রয়েছে। এক-একটি ছত্রীবাড়ির নাম আজও রাজবাড়ি। এ-রাজবাড়ির ভাঙা দেওয়াল, মাটির উঠান, জীর্ণ খড়ের চাল ; রাজার পরনে ময়লা জীর্ণ কাপড়, খোলা গা, বসে বিড়ি খান, অথবা হুঁকো টানেন ; পরস্পরের সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কটু ভাষায় কলহ করেন। রানী-রাজকন্যা নিজেদের হাতেই রান্নাবান্না করেন, নিজেরাই কাঁখে বয়ে জল আনেন, ধান মেলে দেন পায়ে-পায়ে। উঠান নিকানো, বাসন মাজা, এ-সব এখনও ওই কালো রঙের মানুষদের বাড়ির মেয়েরা করে। পুরুষেরা জমি চষে, গোরু চরায়, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক-আধ ঘর দলপতি বা নায়েক-বংশের বাস আজও আছে। দলপতি নায়েক এদের উপাধি। এরা এককালে ছত্রী সামন্তদের অধীনে ছিল যোদ্ধা সর্দার। সামন্তদের দেওয়া নিষ্কর জঙ্গল-মহলে জঙ্গলে-ঘেরা গ্রামের মধ্যে আপনার জাতি-গোষ্ঠী এবং অনুচরদের নিয়ে মত্তে মাংসে, মোটা লাল চালের ভাতে, দুর্দান্ত সাহসে, শিকারে, আর সন্ধ্যায় মাদলের সঙ্গে নাচে গানে জীবনযাপন করত। পাঠান-মোগলের যুদ্ধের কাল থেকে এদের কথা আর প্রবাদ বা কাহিনী নয়, ইতিহাস। মোগলদের শেষ আমলে, মারাঠা অভিযানের সময় এরা রীতিমতো লড়াই করেছে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে গাছের উপর চড়ে তীর ছুঁড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরেছে। তাড়া খেয়ে বাস-বসতি ফেলে নিবিড় জঙ্গলে লুকিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়েছে। সামন্ত রাজারা আনুগত্য স্বীকার করার পরও এরা, এই সর্দারেরা, লড়াই করেছে।

বাগ্দী-সর্দার গোবর্ধন দলপতি যে লড়াই করেছিল কোম্পানীর দপ্তরে তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে। গোবর্ধন দলপতি নিজের অধিকারের সীমানা রক্ষা করেই ক্ষান্ত থাকে নি,

কোম্পানীর সীমানা কেড়ে নিয়ে দখল করেছিল। তার বাইরে এসেও দিনে-দুপুরে গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে, গ্রামের রাস্তায় মানুষের মাথা কেটে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এদেরই এক-আধ ঘরের দেখা আজও মেলে।

সমতলভূমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য-নবশাক-প্রধান গ্রামগুলি এদের থেকে একটু দূরে। ওসব গ্রামেও বাগ্দী, বাউড়ী, মেটে, মাল আছে, তাদের চেহারা যেন কিছু আলাদা। রক্তের উত্তাপ এবং ঘনত্বেও বোধ হয় তফাত আছে।

শালবনে ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য এদের আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। শালের সঙ্গে আছে পলাশ আর মহুয়া। পলাশফুলের গুঁড়ো দিয়ে আজও কাপড় রঙ করে এরা; মহুয়া থেকে মদ চোলাই করে। মধ্যে মধ্যে আবগারী পুলিশ হানা দেয়—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ধরতে পারে না; বিস্তীর্ণ শালবনের মধ্যে কোথায় যে ঘাঁটি, সে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। ধরা কচিৎ পড়ে। ধরা পড়ে জেল খাটে, কিন্তু সে ওদের কাছে বিশেষ কিছু না। মধ্যে মধ্যে শিকারে বের হয়। অবশ্য সাঁওতালেরা এ-ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু এরাও বের হয়ে পড়ে। ময়ূর, বনমোরগ, তিতির, খরগোশ, হরিণ, বরা, ভালুক মেরে পায় বিপুল উল্লাস। বিশেষ করে বরা-ভালুকের উৎপাত হলে খেপে ওঠে এরা। কখনও কখনও বাঘও আসে। তার সঙ্গে লড়াই দেবার মতো সাহসের সে দুর্দান্তপনা আজ আর বোধ হয় নেই। বাঘ এলে স্থানীয় বন্দুকওয়ালা শিকারীদের খবর দেয়। থানা মারফত বিষ্ণুপুর শহরে কর্তৃপক্ষের কাছেও খবর পাঠায়। প্রায় দুশো বৎসর ধরে নিরন্তর শাসনে এবং সুকৌশল শোষণে এদের জীবনের সব শক্তি প্রায় চলে গেছে, এবং সাহস-উল্লাসও কিছুটা খর্ব হয়েছে। কারণ বরা ভালুক মারবার সাহস থাকলেও বাঘ এলে তার সঙ্গে লড়াই করবার রক্ত আজ টাঙ্গি-বল্লম-ধনুক-কাঁড় নিয়ে উন্মত্ত আনন্দে আর বেরিয়ে যেতে চায় না। শুধু রোগের হাতে আত্মসমর্পণে এদের ভয় নেই। রোগ হলে কপালে হাত দেয়। যা করে কপাল। ডাকে শুধু—হে ভগবান,

এদের মধ্যেই থাকেন এই পাগলা পাদরী। আজ কয়েক বছর আগে হঠাৎ এখানে আসেন, এসে থেকে গেছেন। এসেছিলেন যেবার, সেবার এখানে অনাবৃষ্টিতে জল ছিল না। শস্য ছিল না—দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার উপর হয়েছিল মহামারীর প্রাদুর্ভাব। এখানকার মিশনারী সাহেবেরা কাগজে দয়ালু পরিশ্রমী চিকিৎসকের সাহায্য চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—তারই উত্তরে তিনি একদিন একটা ব্যাগ আর বিছানা দুই হাতে নিজেই বয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। এবং থেকেই গেছেন সেই অবধি। লোকে বিশ্বাস করে—ভগবান পাঠিয়েছেন।

শালবনের ধারে লালমাটির উপর একখানি ছোট গ্রাম। পাশ দিয়েই চলে গেছে পুরীর পাকা সড়ক। মাইলখানেক উত্তর-পশ্চিমে মোরার গ্রামে ওয়েসলিয়ান চার্চের দোতলা বাড়িটা। নিতান্তই ছোট নগণ্য একখানি গ্রাম। শালবন এখানটায় বিশীর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত। গ্রামখানারও বাইরে—শালবন যেখান থেকে জমাট বেঁধেছে, সেইখানে—ছোট একখানি বাঙলো বাড়ি; খানতিনেক ঘর। এইটেই তাঁর আস্তানা। সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা পাখি, দুটি গোরু এবং একটি দম্পতি। যোসেফ আর সিন্ধু। যোসেফরা অনেককাল আগে ক্রিশ্চান

হয়েছে। যোসেফলাল সিং। সিন্ধু মাঝিদের মেয়ে। সে ক্রিশ্চান নয়। বিবাহও ওদের হয় নি। দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন সমাজ থেকে চলে এসেছে। আশ্রয় নিয়েছে পাগলা পাদরীর কাছে। যোসেফ খানিকটা ইংরেজী জানে; পাগলা পাদরী তাকে কম্পাউণ্ডারী শিখিয়েছেন, সে কম্পাউণ্ডারী করে আর ছেলেদের পাঠশালায় পণ্ডিতি করে। সিন্ধু পাখিগুলির পরিচর্যা করে এবং বাঙলোরও গৃহিণী সে, রান্নাবান্না ভাঁড়ার তারই হাতে। আরও একটি সাঁওতাল মেয়ে আছে, নাম ঝুমকি মেঝ্যান। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের আশ্চর্য স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। এমন সরল দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

পাগলা পাদরী ওকে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। ঝুমকির বিয়ে হয়েছিল তিনবার। তিন স্বামীই অল্প দিনের মধ্যে মারা যায়। তারপর সকলের সন্দেহ হয়, ঝুমকি ডাইনি। সাঁওতালদের সমাজপতিরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ওকে। পাগলা পাদরী খবর পেয়ে বাইসিক্ল চড়ে ঝড়ের বেগে সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে ওকে উদ্ধার করে এনেছেন। ওই গ্রামের সাঁওতাল কর্তাকে তিনি চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। আরও অনেকেরই চিকিৎসা করেছেন। পাগলা পাদরীর কথা তারা ঠেলতে পারে নি। পাগলা পাদরী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কখনও ঝুমকি কোনো সাঁওতাল গ্রামে যাবে না। সে তাঁর বাড়িতে থাকবে, গোরুর সেবা করবে, গাছপালা লাগাবে।

'উকে কেরেস্তান করাব না তো বাবাসাহেব?'

'না।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'আমি কি কেরস্তান মাঝি?'

বৃদ্ধ সাঁওতাল সর্দার বলেছিল, 'কে জানে? ই বলে তু কিরিস্তানি বটিস; আবার কিরিস্তানরা বলে—কিরিস্তান লয়; তুর জাতই নাইক। তু জানিস তু কী বটিস?'

পাগলা পাদরী হা-হা করে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'ওরা বলে মাঝি, জাত আমার নাই। তবে মানুষ তো বটি। তুইও মানুষ আমিও মানুষ। ওর মেয়েটাও মানুষ।'

'তু মানুষ বটে। উ লয়। উ ডাইনি বটে'।

'আমি তো চিকিৎসা করে তোর এত বড়ো ভূতে-পাওয়া ব্যামোটা সারালাম,—তু বল! উকেও আমি ডাইনি থেকে সারাব রে।'

'লারবি। তবে তু বলছিস নিয়ে যাবি, নিয়ে যা।'

সেই অবধি ঝুমকিও থাকে এখানে। গোরুর সেবা করে, বাঙলোতে গাছপালা লাগায়। রাস্তায় ঘাটে বাঙলোর সীমানার বাইরে কদাচিৎ বের হয়। সাঁওতাল পুরুষ-মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে ছুটে গিয়ে লুকোয়, যেখানে হোক। তারা যদি আবার বলে, সে তাদের খেয়েছে।

পাগলা পাদরীর ঘরেই হয়তো ঢুকে পড়ে। পাগল মানুষটি চোখ বন্ধ করে ঝোলা ডেক-চেয়ারে বসে থাকে কি ভাবে, সন্তর্পিত পদক্ষেপের শব্দ কানে আসতেই প্রশ্ন করে, 'কে?'

ফিসফিস করে শঙ্কিত ভঙ্গিতে সে অন্ধকার কোণ থেকে বা আলমারির পাশ থেকে উত্তর দেয়, 'মেন এয়াং—বাবাসাহেব। ঝুমকি।'

বাবাসাহেব মুখ তুলে তার দিকে তাকান, কৃষ্ণাঙ্গী অরণ্যনারীর সাদা জলজলে চোখের

দিকে তাকিয়ে, স্বচ্ছ জলতলে নাড়াখাওয়া শ্যাওলার দলের মতো ওই দৃষ্টির মধ্যে ওর ভয়ে-কাঁপা অন্তরকে দেখতে পান। প্রশ্ন করেন, 'ভয় পেয়েছিস? বাইরে মাঝিরা এসেছে বুঝি?'

সে তার দীর্ঘ সরল হাতখানি অন্য এক দিকে বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'অঁ-হুঁ, আন্-পরম্।' অর্থাৎ না-না, এই দিকে, এই দিকে।

বাইরে আসে নি, ওই দিকে তারা যাচ্ছে।

বাবাসাহেব অভয় দিয়ে বাইরে আসেন। যারা যায় তাদের সঙ্গে ডেকে আলাপ করেন তাদেরই ভাষায়। অনর্গল বলে যান।

সাধারণত এই জেলার চলিত বাঙলাতেই কথা বলেন। কেউ বুঝতে পারে না যে তিনি এখানকার লোক নন। তারা কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, 'হাঁ বাবাসাহেব, আমাদের কথাবার্তা বাকবাচালি এমন করে কী করে শিখলেন গো আপুনি?'

সাহেব প্রসন্ন প্রাণখোলা হাসিতে উতলা বাতাসে শালগাছের মতো দুলে ওঠেন; বলেন, 'তুমাদিগকে যি ভালোবাসলম হে! সেই মন্তরে শিখে লিলম। হঁ!'

তারপর আবার বলেন, 'তুমি বল ক্যানে, যাকে তুমি ভালোবাস, তার মুখটি দেখে তুমি তার পরাণের সুখ-দুখটি বুঝতে পার কি না? পার তো? ভালোবাসলে পরাণের কথাটি মুখ দেখে বোঝা যায়, আর মুখের কথা কানে শুনে শিখা যাবেক ইটা আর বেশী কথা কী হে? অ্যাঁ? না—কি? তুমিই বল না হে মহাশয়!'

একেবারে সুর স্বর উচ্চারণ সব যেন একতারে বাঁধা।

প্রশ্নকর্তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তার সারা অন্তর উপলব্ধিতে আপ্লুত হয়ে যায়, আপন মনেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, ঠিক কথা! ঠিক কথা! হঁ! হঁ!

তবে তাঁর ইংরেজী শুনে ভদ্রসমাজের অনেকে সন্দেহ করেন, হয়তো লোকটির কয়েক পুরুষ ধরেই ইংরেজী ভাষা বলে আসছে—হয়তো কয়েক পুরুষ ধরেই কৃশ্চান। হয়তো বা মাদ্রাজী, কারণ নাম রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী।

চেহারাতেও দক্ষিণের মানুষের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ছ-ফুট লম্বা, মোটা মোটা হাড়, মেদবর্জিত দেহ, কালো মাজা রঙ, ঘন কালো মোটা সরনের চুল। দক্ষিণের লোকদের মতোই বড়ো বড়ো চোখ।

দৃষ্টি কিন্তু বড় বিচিত্র, বলতে হয় আশ্চর্য, অপার্থিব। বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন। বর্ষণক্লান্ত স্বল্পমেঘাবৃত শান্ত স্নিগ্ধ আকাশের মতো। ভিতরের নীলাভা মেঘের পাতলা আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসার মতোই লাগে ও মুখটির হাসি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফের আবরণের মধ্য থেকে যখন সুগঠিত দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে হাসির প্রসন্নতায়, তখন আশপাশের মানুষগুলির মনের ভিতরটাতেও যেন সেই প্রসন্নতার ছটা গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

দুই

পাগলা পাদরী এখানে এসেছে আজ বছর আষ্টেক। ১৯৩৬ সালে। সেবার এখানে দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়েছিল। এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠেছে।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগ একটা সাইক্লোনের মতো পৃথিবীর সঙ্গে ভাগ্যাহত বাংলা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেশ সমাজ ঘর ভেঙেচুরে পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরছে—ঝড়ে ঝটকা-খাওয়া পশুপক্ষীর মতো। হাহাকার উঠেছে চারিদিকে। হাহাকার! হাহাকার আর হাহাকার! দেশ-জোড়া স্বাধীনতা-আন্দোলনও সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধে স্থম বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম-ফেনী-গৌহাটি ডিগবয়-ডিমাপুর-কোহিমার পরে উখরা-পানাগড়-খিরাবাডোবা-বাসুদেবপুর-খড়্গপুর-মেদিনীপুর নিয়ে যুদ্ধের ঘাঁটির সে এক বিচিত্র বেষ্টনী। পিচঢালা সুগঠিত পথের একটার সঙ্গে অন্যটার যোগাযোগে একটা বিস্তীর্ণ বিরাট ভূ-ওয়ারাপী মাকড়শার জাল।

গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার, শহরে শহরে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ভিক্ষুকদের সকরুণ কাতর প্রার্থনা, 'একটু ফ্যান! একমুটো এটোকাঁটা! মাগো মা!'

দোকানে চালের বদলে খুদ। তার সঙ্গে বালি ধুলো কাঁকর।

এরই মধ্যে চলে মিলিটারি কনভয়। জীপ-ট্যাঙ্ক-ওয়েপনকেরিয়ার, আরও হরেক রকমের বিচিত্রগঠন অটোমোবিল। মাথার উপরে ওড়ে ইংরেজ আর আমেরিকানদের যুদ্ধের প্লেন। গাড়িগুলোতে বোঝাই হয়ে চলে ইংরেজ এবং আমেরিকার পল্টন। তার সঙ্গে নিগ্রো কাফ্রী। যাবার সময় পথের ধারে মাঠে নেমে পড়ে এ-দেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ক্ষুধার্তদের উপর কমলালেবুর খোসা, চিবানো কোয়া ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিৎকার করে ডেকেও যায়, হে—। হাতছানি দিয়েও ডাকে।

হি হি করে হাসে।

কেউ কেউ আবার টাকা আধুলি ছুঁড়ে দেয়। ওরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর উপর। শুকনো মাটির ধুলো ওড়ে। ওদের সর্বাঙ্গে লাগে। ওদিকে বিদেশী সৈনিকদের ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। ঘৃণা অনুকম্পা কৌতুক সব কিছু আছে সে-হাসির মধ্যে।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, দল বেঁধে শ্বেতাঙ্গ সেপাইরা জীপে চড়ে চলেছে। সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে, অথবা প্রমত্ত কলরব তুলেছে। এবং তাদের ঠিক মাঝখানে শহর থেকে সংগ্রহ-করা একটা কি দুটো নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী, তাদের সকল আনন্দের উৎস, কড়া বিলাতী মদের নেশায় স্খলিতবসনা, অবশদেহ, টলছে বা ঢুলছে, ওদেরই অট্টহাসির সঙ্গে প্রমত্ত উল্লাসে হেসে সুর মেলাতে চাচ্ছে। পথে-ঘাটে যুবতী মেয়ের দেখা পেলেই ডাক—হ্যালো হনি! মাই হনি! হনি হতভাগিনীরা ভয়ে শুকিয়ে কাঁপতে কাঁপতেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। দু-

চারজন, স্বৈরিণী যারা, তারা দাঁড়িয়ে নির্লজ্জার মত দাঁত মেলে হাসে।

পিয়ারাডোবায় একটা এরোপ্লেনের আড্ডা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুরে ছোট একটা। মোয়ারে ওয়েশলিয়ান চার্চের বাঙলোটার সামনে পুরীর রাস্তা আর স্থানীয় একটা রাস্তার মিশবার জায়গাটার পাশেই শালজঙ্গলের কোল ঘেঁষে প্রান্তরটা খুঁড়ে বড়ো বড়ো পেট্রল-ট্যাঙ্ক বসেছে। এখান থেকে পাইপ-লাইন চলে গেছে বাসুদেবপুরে, পিয়ারাডোবা পর্যন্ত। বুলডোজার চালিয়ে মাটি কেটে বন কেটে গুজলে কয়েকদিনের মধ্যে গড়ে তুলেছে বিচিত্র সামরিক ঘাঁটি। ময়দানবের হাতের মায়াপুরীর মতো। পিয়ারাডোবা স্টেশন থেকে সাইডিং এসেছে। বড়ো বড়ো ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে প্রমত্ত বিদেশী সৈনিকের দল। মার্কিন সৈন্যদের পকেটে নোটের তাড়া। সঙ্গে প্রচুর টিনবন্দী খাদ্য। বিস্কুট রুটি। সাইডিঙের পাশে, স্টেশনের রেললাইনের পাশে—টিনের ছড়াছড়ি নয়—টিনের গাদা।

হতভাগ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধনগ্ন মানুষেরা টিন কুড়িয়ে নিয়ে যায়, চেটে চেটে খায়। দিনরাত্রি আকাশ মুখরিত করে বম্বার ফাইটারগুলো মাথার উপর ঘুরছে। কোনোটা নামছে, কোনোটা উঠছে।

সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। ঠুলি পরানো, কিন্তু তবু তার ছটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আড্ডাঘরে বাজনা বাজে, নাচ হয়। হো-হো শব্দে উল্লাসধ্বনি ওঠে। ঝিল্লিমুখর শালবনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার চমকে ওঠে। মাঝে মাঝে ঝিল্লিরাও বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ করি প্রায় দুশো বছর আগের সামন্ত রাজাদের আমলে পাইকদের মশালের আলো, মাদলের বাজনা, হা-রা-রা ধ্বনি—তাণ্ডবের পর বনভূমির অন্ধকার এইভাবে আর চমকায় নি, ঝিঁঝিরাও হঠাৎ থামে নি। বর্গীদের আমলের পর বনভূমির মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলি এমনভাবে আর সভয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে পড়ে নি। এসব গ্রামগুলি পাকা রাস্তা থেকে দূরে-দূরে। বনের ভিতরের দিকে। সেখানে তারা অন্ধকারের মধ্যেই শোনে, পাকা রাস্তার উপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে মোটর চলেছেই, চলেছেই। কখনও কখনও পল্টনের হৈ হৈ শব্দ। তারই মধ্যে মেয়ের গলায় খিল্‌খিল হাসি শুনে তারা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ বড় করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে—এ মেয়েরা কারা? কোন দেশের? কোন জাতের?

* * * *

পাগলা পাদরী সরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন। পাকা রাস্তা থেকে আরও দূরে জঙ্গলের মধ্যে। তিনি যে গ্রামখানায় ছিলেন, সেই গ্রামখানাকেই সরে যেতে হয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশে। অবশ্য টাকা তারা অনেক পেয়েছে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী জঙ্গলের ভিতরের পায়ে-চলা পথ ধরে বাইসিক্লে চড়ে এসে ওঠেন পাকা রাস্তায়। মোয়ারের মোড় থেকে অনেকটা তফাতে, বিষ্ণুপুরের দিকে এগিয়ে এসে বুধবার শনিবার তিনি ওন্দায় যান। ওখানকার লেপার অ্যাসাইলামে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করেন। পুরী থেকে এই অঞ্চলটায় কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কুষ্ঠ অন্তত এ-অঞ্চলের

অভিশাপের মতো। সপ্তাহে দু-দিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভোরবেলা উঠে যান, ফেরেন বিকেলবেলা। সেদিন আষাঢ়ের প্রথম। কৃষ্ণস্বামী বিকেলবেলা ফিরছিলেন। তাঁর বিচিত্র পরিচ্ছদের উপর মাথায় একটা দেশী টোকা, চোখে একটা গগ্‌ল্‌স। বৃষ্টি তখনও নামে নি। আষাঢ়ের দিন—দীর্ঘতম এবং সব থেকে বেশী উত্তাপ; পৃথিবীর নিকটতম সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী যেন ঝলসাচ্ছিল। চষা মাঠের উপর গরম বাতাসে ধুলো উড়ছিল।

বাবাসাহেব তাঁর অভ্যস্ত গতিতে বাইসিক্‌ল চালিয়ে চলেছেন। গোটা রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে একপাশ ধরেই চলেছেন তিনি। প্রচণ্ড জোরে আসে মিলিটারী ট্রাকগুলি, মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় অথবা হিসেবের ভুলে প্রচণ্ড জোরে গিয়ে ধাক্কা মারে পথের পাশের গাড়িতে। ভেঙে উল্‌টে যায় গাড়ি; চালক আরোহীর আর্তনাদ শোনা যায়। কখনও পথ ছেড়ে গিয়ে পড়ে মাঠের উপর। দু-চারখানা উল্‌টে যায়, আরোহীরা ছিটকে পড়ে। আঘাত কম হলে উঠে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে হো-হো করে হাসে। দু-চারখানার চালক আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে স্টীয়ারিং ধরে চষা মাঠের উপর দিয়ে কিছু দূর চালিয়ে গিয়ে গতিবেগ সম্বরণ করে ব্রেক কষে। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ভাষায় একটা অশ্লীলতম গালাগালি উচ্চারণ করে। অকারণে। আশ্চর্য, ঈশ্বরের নাম করে না!

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন: বর্গীর হাঙ্গামার সময়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধের কালে, পাইক-বিদ্রোহের সময় কি এমনই হয়েছিল দেশের অবস্থা? মানুষ কি এমনি করেই দেউলে হয়ে গিয়েছিল? অন্তরের সঞ্চয় তার এত ক্ষীণ এবং ক্ষণজীবী?

হায় বুদ্ধ! হায় ক্রাইস্ট! হায় ঈশ্বরের পুত্র! হায় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ!

এ-দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত হৃতসর্বস্ব শিক্ষায়-বঞ্চিত এই মানুষগুলির তবু তো দোহাই আছে। হয়তো ভগবানের কাছে রেহাইও আছে। কিন্তু ওই বিদেশী সৈনিকগুলি! এদের চেয়েও ওরা হতভাগ্য। মৃত্যু-ভয়ে অধীর। অসহায়। অহরহ দুরন্ত ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওরা আকণ্ঠ মদ্যপান করে জীবন নিয়ে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, গাছে ধাক্কা খেয়ে মরছে। গাড়ি উল্‌টে পড়ে চেপটে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে পথের মধ্যে যা পাচ্ছে ভোগ করবার, তা-ই ভোগ করে যাচ্ছে। কোথায় শিক্ষা, কোথায় সভ্যতা, কোথায় জীবন-গৌরব?

হায় ক্রাইস্ট!

ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তোমার মৃত্যুই সত্য। রেসারেকশন কল্পনা। মানুষের রচনা-করা মিথ্যা আশ্বাস!

হায় বুদ্ধ! হায় চৈতন্য!

চৈতন্যদেব এই পথে পুরী থেকে গয়া গিয়েছিলেন। খোলে-করতালে ঈশ্বরের নামে মুখরিত হয়েছিল এ-সব অঞ্চলের আকাশ-বাতাস।

বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব দেবতারাও মিথ্যা। পারলে না রক্ষা করতে মানুষকে। রাজা গোপালদেবের বেগার মিথ্যে। নাম করায় কোনো ফল হয়নি। আত্মরক্ষার শক্তি না থাক, ওদের মতো প্রচণ্ড বর্বর শক্তিকে ঠেকাবার মতো শক্তি মানুষের না থাক, আত্মাকে রক্ষা

করার শক্তিও তারা পেলে না। রূপের মালার ঝুলিটা নেহাতই ছেঁড়া নেকড়ার ঝুলি।

সামনেই লেবেল ক্রসিং। বাইসিক্ল থেকে কৃষ্ণস্বামী নামিয়ে দিলেন তাঁর পা দুটো। ছ-ফুট লম্বা মানুষটির পক্ষে ওই যথেষ্ট। ক্রসিংয়ের পাশেই গেটম্যানের বাসা।

কৃষ্ণস্বামীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বাস্তবে ফিরে এলেন। এ-ই জীবন। এ-জীবন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ নিজের কাজ করতে হবে।

'বংশী! বংশী হে—'

খুলে গেল গেটম্যানের ঘরের দরজা। বেরিয়ে এল গেটম্যান রামচরণ।

'বাবাসাহেব!'

'হুঁ। বংশী কই হে?'

বংশী রামচরণের ছেলে। বংশীর কুষ্ঠ হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থা। কৃষ্ণস্বামীই যাওয়া-আসা'র পথে ছেলেটির মুখের চেহারা দেখে ধরেছেন। এবং অনেক বুঝিয়ে চিকিৎসা করাতে রাজী করিয়েছেন। এ রোগের ইনজেকশনে বড়ো যন্ত্রণা হয়। বংশী অধিকাংশ দিন পালায়। কৃষ্ণস্বামী বংশীকে প্রলুব্ধ করবার জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসেন। কোনোদিন একটা পুতুল। কোনোদিন একটা ছবি। কোনোদিন কিছু খাবার। কোনোদিন অন্য কিছু। আজও বংশী পালিয়েছে। রামচরণ চারিদিকে তাকিয়ে দেখেও ছেলের সন্ধান পেলে না। সে তারস্বরে ডেকে উঠল—'হ—বং—শী রে—! বং—শী—ই—!'

কৃষ্ণস্বামী বাইসিক্লটি গেটম্যানের ঘরের দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে, দাওয়ার উপর উঠে দাঁড়ালেন। রামচরণের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে একটা মোড়া পেতে দিলে কৃষ্ণস্বামী মোড়ায় বসে তাঁর আলখাল্লার মতো জামাটার পকেট থেকে বের করলেন একটি বাঁশি। বললেন, 'এইটো বাজিয়ে ডাকো হে! হুঁ। বাঁশির ডাক শুনলে কাছে-পিঠে থাকলে আপুনি বেরিয়ে আসবেক।'

তার আগেই কিন্তু সামনে রাস্তার ধারের একটা আমগাছের উপর থেকে ঝপ করে বংশী লাফিয়ে পড়ল। 'আসছেক গ, আসছেক গ! সেই গ বাবা, সেই বটেক গ!'

কৌতূহলের তীব্রতায় তার ঈষৎস্ফীত মুখখানা যেন থমথম করছে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'কে? কে আসছেক হে বংশীবদন?' হেসে প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণস্বামী। 'আমি তুমার লেগ্যা কেমন বাঁশি এনেছি দেখো হে? বংশীবদন লেগ্যা বংশী।'

বংশীর মন কিন্তু বাঁশিতে ভুলল না। তার স্থির জলজলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সামনের রাস্তার দিকে। দূরে একটা বাঁক, সেই বাঁকের মাথায়। সে বোধ হয় বাবাকেই বললে, 'সেই মেমাছেল্যাটা গ! সেই মাথায় টকটকে রাঙা ফেটা বাঁধা! গাছের শিরডগাল থেকে আমি দেখ্যাছি। ঝড়ের পারা গাড়িটা আসছেক, আর রাঙা ফেটা বাঁধা সি বসে রইছেক। রোদ লেগ্যা ঝকমকো করছেক। হুঁ। উই—উই—উই।'

দূরে বাঁকের মাথায় গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সত্যই একখানা জীপ আসছে। সত্যই পিছনের পড়ন্ত রোদে কারও মাথার গাঢ় লাল টুপি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রামচরণ বললে, 'দেখলাম অনেক বাবাসাহেব। কিন্তুক এমন মেয়েছেল্যা আমরা দেখি নাই বাবার কালে। মেমসাহেব গো!'

হাসলেন কৃষ্ণস্বামী। ধুতি-চাদর আর চটির দেশের শুধু ধুতিসম্বল দরিদ্র রামচরণ এবং বালক বংশীবদনের মন কোনো বিচিত্রবাসিনী বিদেশিনীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। জীপখানা সত্যই ঝড়ের বেগেই আসছে। মেয়েটা—হাঁ, এরা বলেছে ওটি মেয়ে—লাল-টুপি পরা মেয়েটি যেন দুলছে টলছে। এপাশ থেকে ওপাশ। জীপের সামনে চালকের পাশেই বসে টলছে। মনে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গিনী। পাশে চালক একজন হৃষ্টদেহ শ্বেতাঙ্গ। গায়ে শুধু গেঞ্জি, মাথায় টুপিটা আছে, অফিসারের টুপি। স্পীড কমিয়ে বাঁক নিয়ে লেভেল-ক্রসিংটা পার হয়ে চলে গেল গাড়িটা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ব্রেক কষে দাঁড়াল। তার ঝাঁকিতে মেয়েটা টলে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। সামনের ড্যাশ-বোর্ডে উপুড় হয়ে পড়ে কোনোক্রমে আঁকড়ে ধরলে একটা রড। আবার পিছু হটতে লাগল গাড়িটা। এসে দাঁড়াল রামচরণের বাড়ির সামনে। শ্বেতাঙ্গটি নামল।

তার ট্রাউজারের কাপড়ের চিক্কণতা দেখে কৃষ্ণস্বামী বুঝতে পারলেন, আমেরিকান অফিসার।

হে—ম্যান! ওয়াটার ওয়াটার! পানি!

জড়িত কণ্ঠে আদেশের সুরে মেয়েটিও বললে, 'পানি লাও! ই—উ! ইউ! শুনতা নেহি!'

কৃষ্ণস্বামী উঠে দাঁড়ালেন। চোখের গগল্‌সটা খুলে দাওয়া থেকে নেমে এসে জীপের কাছে দাঁড়ালেন। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলেন। বিচিত্রবেশিনীই বটে। পরনে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিকতম ফ্যাশনের লালরঙের লম্বা পেন্টালুন বা স্ল্যাক্‌স, গায়ে হাফ হাতা টেনিস-কলার মিহি সিল্কের ব্লাউস, মাথায় রাঙা টকটকে সিল্কের কাপড়ের লম্বা ফালির শিরোভূষণ। আশ্চর্যভাবে লালসা-উদ্রেক-করা মোহিনী বেশ। তেমনি যেন নির্লজ্জ!

আমেরিকানটি তাঁর সামনে এসে পেন্টালুনের পকেট থেকে একখানা নোট বের করে সামনে ধরে বললে, 'ডোণ্ট য়ু আণ্ডারস্টাণ্ড, ম্যান? ওয়াটার, পানি—পানি—'

মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ইউ সোয়াইন!'

আমেরিকানটি আবার ধমক দিয়ে উঠল, 'ইউ বিচ, স্টপ, আই সে—ইউ স্টপ! কীপ সাইলেণ্ট!'

কৃষ্ণস্বামী হেসে পরিষ্কার ইংরিজীতে বললেন, 'প্লীজ, প্লীজ ডোণ্ট অ্যাবিউজ হার লাইক দ্যাট, শী ইজ ইল।'

'নাথিং।' ইউ ডোণ্ট নো ম্যান, একটা পুরো বোতল মদ ওই ক্রুটিটা ঢক-ঢক করে গিলেছে। মাতাল হয়েছে। জল দাও। ভেবেছিলাম রাস্তার ধারে পুকুর পেলে ওকে চুবিয়ে ওর নেশা ছুটিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ি দেখে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। নেশা. কেবল নেশা।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অফিসার, আমি একজন ডাক্তার। আমি দেখতে পাচ্ছি, ও অসুস্থ।

আমি বলছি তুমি ওকে নামাও। ওর এক্ষুনি শুশ্রূষার দরকার। আমার কল-ব্যাগে ওষুধ আছে। এক দাগ ওষুধও দিতে চাই। বিশ্বাস করো আমাকে, আমি মেডিকাল কলেজের পাস-করা ডাক্তার।'

বলতে বলতে ওদিকে মেয়েটি ঢলে পড়ে গেল গদির উপর।

কৃষ্ণস্বামী গিয়ে তাঁর দীর্ঘ দুটি বাহু প্রসারিত করে তাকে তুলে নিলেন। বললেন, 'রামচরণ, তোমার খাটিয়াটা পেতে দাও।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, 'অফিসার, প্লীজ ওর মাথার বাঁধনটা, কাপড়ের ফালিটা, খুলে দাও।'

হাত বাড়িয়ে একটু ঝুঁকি দিয়েই মাথার কাপড়ের ফালিটা টেনে খুলে ফেলে দিলে অফিসারটি। আশ্চর্য ঘন কালো একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ল!

কৃষ্ণস্বামী সযত্নে তাকে শুইয়ে দিলেন খাটিয়ার উপর।

অনেক শুশ্রূষার পর মেয়েটির চেতনা হল। একদাগ ওষুধও তাকে খাইয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী। চেতনা হবার আগে হড়হড় করে বেশ খানিকটা বমি করলে মেয়েটি। তার গায়ের জামাটা ভেসে গেল। খানিকটা কৃষ্ণস্বামীর হাতে জামায় লাগল। দুর্গন্ধে জায়গাটার বায়ুস্তরও যেন দূষিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণস্বামী সযত্নে সব ধুয়ে মুছিয়ে দিলেন। অফিসারটি নির্লিপ্তের মতো বসে বসে দেখলে, আর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে দু চারটে কথা বলছিল। সবই প্রশ্ন। যেন থেকে থেকে হঠাৎ মনে উঠছিল। পারম্পর্যহীন। একটা প্রশ্নের সঙ্গে আর-একটার কোনো সম্পর্ক নেই।

চৈতন্যহীন মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে ছিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইজ্ন্ট্ শী বিউটিফুল? কাইন্ড লাইক অ্যাণ্ড মেইডেন—ইজ্ন্ট্ ইট্? হে, হোয়াট ডু যু সে?'

কৃষ্ণস্বামী শুশ্রূষা করতে করতেই বললেন, 'ইয়েস, শী হ্যাজ গট এ সুইট ফেস।'

সত্য, মেয়েটির রূপ আছে এবং রূপে আশ্চর্য মোহও আছে। বিশেষ করে মাথার চুল ঘন কালো আর অপরূপ সুন্দর চোখ ও চোখের পাতা। চোখের পাতার রোমগুলি সুদীর্ঘ। সুন্দর আয়ত চোখ দুটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

আবার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'ইজ ইট এনিথিং ভেরি সীরিয়স?'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'হতে পারত। নেশার উপরে এই গরমে হীট্ স্ট্রোক হতে পারত। অবশ্য এখনও আশঙ্কা যায় নি।'

আবার কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন হল, 'তুমি বললে, তুমি একজন ডক্টর। কোয়ালিফায়েড মেডিক্যাল ম্যান। মনেও হচ্ছে তাই। কিন্তু এ-রকম পোশাক কেন তোমার?'

'আমি একজন সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের নানান রকম পোশাক আছে। কিন্তু এই রঙটা হল সবার রঙ।'

'ক্যান ইউ টেল ফরচুন?'

'নো।'

'শুধু ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, আর সন্ন্যাসী!'

'এ কি, তোমার গলায় ও কি? ক্রশ?'

'হ্যাঁ, ক্রশ। আমি ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী।'

'ভারতীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী! ইয়্ আর এ বেভ'রেণ্ড।'

কৃষ্ণস্বামী উত্তর দিলেন না। মেয়েটির সেবায় মন দিলেন। মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জ্যামিতির দুটি কোণ সমান দুটি ত্রিভুজে যেমন মিলে যায় তেমনি দুটি মুখ মিলে যাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ পর অফিসারটি বললে, 'বলতে পার এই ধরনের মেয়ে তোমাদের দেশে কত আছে? স্ট্রেঞ্জ গার্ল।' আপন মনেই বলতে লাগল, 'ওর সঙ্গে আমার দেখা পুরীতে। অন দ্য সী-বীচ! স্ট্রেঞ্জ গার্ল! এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। আশ্চর্য বন্ধু! কী হাসতে পারে! কী প্রচণ্ড রাগে! কী মদ খায়!' সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বললে, 'সেই থেকে আমার সঙ্গে ঘুরছে।' আবার বললে, 'শী ইজ এ স্পোর্ট—কিন্তু বড়ো ওয়াইল্ড্।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'জ্ঞান হচ্ছে। তোমার কাছে আর একটু মদ আছে? শী নীড্স—'

মেয়েটি মদ খেয়ে মুখ একটু বিকৃত করে বললে, 'ওয়াটার—প্লীজ! ওয়াটার—টাণ্ডা জল!'

মুখে জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। মেয়েটি আবার হাঁ করলে। আবার জল দিলেন কৃষ্ণস্বামী। তারপর চোখের নীচে আঙুল রেখে হেসে বললেন, 'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ! লুক অ্যাট মাই ফেস!'

মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল, তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল দৃষ্টি।

আমেরিকান অফিসারটি বললে, 'হে—ডোণ্ট—; ও সব কোরো না, ডু-ইউ হীয়ার?' তার পরে বললে, 'হঠাৎ চিৎকার করে, হঠাৎ চড় মেরে বসে। শী ইজ হিস্টিরিক!'

তৎক্ষণাৎ কিন্তু মেয়েটা ধড়মড় করে উঠে বসেছে। তীব্র দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'ইউ ব্ল্যাকি—লীভ মি—; ছেড়ে দাও আমাকে—কালা আদমী কোথাকার!'

অফিসারটি চিৎকার করে উঠল, 'শাট আপ, ইউ বিচ! শাট আপ, আই সে!'

কৃষ্ণস্বামী হেসে প্রসন্নকণ্ঠে মেয়েটির কপালে ভিজে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি অসুস্থ। আমি ডাক্তার। আমার কথা তোমার শোনা উচিত। আর একটুক্ষণ শুয়ে থাকো তুমি। সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে আমি জানি। তুমি এই বড়িটা খেয়ে ফেলো। প্লীজ! পীস অ্যাণ্ড বি স্টীল।'

মেয়েটি যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাঁর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কৃষ্ণস্বামী ব্যাগটা খুলতে খুলতে আবৃত্তির সুর এনে বলেই চলেছিলেন, 'পেশেন্স ইউ ইয়ং রোজ-লিপ্ড্ মেড—পেশেন্স প্লীজ;—'

শেক্সপীয়রের ওথেলো-নাটকের অংশ আবৃত্তি করছিলেন। এক্ষেত্রে খেটে গেছে।

অফিসারটি হেসে উঠল, 'হে ডক্—ইউ আর এ পোয়েট—আ—ভ্যাটস্ ফাইন!'

মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে শুয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু তার মসৃণ ললাটে কয়েকটি রেখা বিস্ময়ের বা প্রশ্নের কুঞ্চনে পুষ্ট হয়ে জেগে উঠেছে। চোখের কোণে কালো দাগ—জীবনে অমিতাচারের রথের চাকার দাগের মত।

'নাও, খেয়ে ফেলো।'—একটা পিল বের করে কৃষ্ণস্বামী ডাকলেন।

বড়িটা খেয়ে মেয়েটি উঠে বসল। বললে, 'নো। নেভার। সে হতে পারে না তুমি। নো।' তারপর হাত বাড়িয়ে অফিসারকে বললে—'এ স্মোক প্লীজ।' নেল-পলিশ-লাগানো আঙুলের ডগায় নিকোটিনের দাগ। অফিসারটি সোৎসাহে বলে উঠল, 'নাউ শী ইজ ও-কে। টেক ইট। কেপ্ট আপ মাই হনি। হিয়ার ইজ ফায়ার।' সে সিগারেট দিল মেয়েটিকে। এবং লাইটারটা জেলে ধরিয়ে দিল সিগারেটটা।

তারপর কৃষ্ণস্বামীর দিকে চেয়ে বললে, 'ও ঠিক হয়ে গেছে ডক, ও-কে। আমরা এবার যাব। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এই নাও।'

খান দুয়েক দশ টাকার নোট বের করে ধরলে।

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু মাপ করো আমাকে। এই আমার ধর্ম; এই আমার ঈশ্বরোপাসনা। ক্রাইস্টের নামে তোমাকে অনুরোধ করছি।'

মেয়েটি স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবং একভাবে সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

জীবনের বন্ধ-করা ঘরে যেন বাইরে থেকে ঘা পড়ছে। কে যেন মাথা ঠুকছে।

গাড়িখানা গর্জন করে চলে গেল। বংশী বলে—'মেয়াটো তাকায়ে রইছে দেখ বাবা। বাবাসাহেব উয়ার নেশাটো ছুটায়ে দিলেক বিনা! রেখেছে!'

তিন

কৃষ্ণস্বামী তাঁর আশ্রমে ফিরে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে ছিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

ঝুমকি এসে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে লাল সিং আর সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস করে বললে, 'সিং, বাবাসাহেবের কী হইছে?'

লাল সিং আকাশের দিকে তাকিয়ে কোনো দূরে গর্জমান উড়োজাহাজের সন্ধান করছিল। ঝুমকির কথায় সে ফিরে তাকালে, 'কী হয়েছে?'

'বিড়বিড় করে কী বলছে, মন্তর-টন্তর বুলছে শুনলাম আমি। ভয়ে পালিয়ে এলাম। চা দিতে লারলাম। তুরা দে গে যা। বাবা রে!'

মন্ত্র-টন্ত্রের মতো কিছু শুনলে ঝুমকির ভয় করে। মনে হয় হয়তো তাকেই ডাইনি ভেবে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। দিনের বেলা হলে সে পালিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। চুপ করে বসে থাকে

ঝোপের ভিতরে খরগোশ-শজারুর মতো। অনেকক্ষণ কেটে গেলে ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসে। তখন গুনগুনিয়ে গান করে, তারপর উঠে আসে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে লাল সিং কৃষ্ণস্বামীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সে জানে, মধ্যে মধ্যে বাবাসাহেব বাইবেলের সার্মন আপন মনে বলে যান। সে আপনার কপালে গায়ে প্রথামতো অঙ্গুল ঠেকিয়ে 'আমেন' বলে।

সত্যই বাবাসাহেব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপন মনে বাইবেল বলে যাচ্ছেন। বাইবেল নয়, কৃষ্ণস্বামী আবৃত্তি করছিলেন,

It is the cause—it is the cause my soul—

Let me not name it to you, you chaste stars—

It is the cause.

Yet I'll not shed her blood.

Nor scar that whiter skin of her's than snow.

শেক্সপীয়রের ওথেলো থেকে আবৃত্তি করছেন কৃষ্ণস্বামী। আজ রামচরণের বাসা থেকেই ওথেলো মনে পড়ে গেছে। ওই যে রটার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে তিনি ওথেলোর কথা কত ব্যবহার করেছেন।

'লেট মি লুক অ্যাট ইওর আইজ। লুক অ্যাট মাই ফেস। দীস অ্যান্ড দী সীন।'

ওই সবই ওথেলো নাটকের সংলাপ।

'পেশেন্স, ইউ ইয়ং রোজ-লিপড্ মেড—'

এরও অনেকটা মনে আছে। আমেরিকান অফিসারটির এসব বুঝবার কথা নয়। খাস্থ-মত্ত নারী-হুল্লোড়-যুদ্ধ, এ ছাড়া এ-সব বুঝলে যুদ্ধ চলে না। অবশ্য কিছু কিছু উচ্চস্তরের লোক আছে, হয়তো অনেক কবি কলম ছেড়ে কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে রাইফেল কাঁধে এসেছে, কিন্তু তারা ক-জন? তারা অন্তত এমনিভাবে মেয়েটিকে সাথে নিয়ে বেড়াত না। বেড়ালে বুঝতে হবে—তাদের জীবন-সত্য 'হেসে নাও দু'দিন বইত নয়' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাকী সব তারা মুছে দিয়েছে। হয়তো বা ভুলেই গেছে। রিনা ব্রাউনেরও তাই হয়েছে। অতীত বোধ হয় মুছে গেছে। নইলে এমন কি করে হল? সেই রিনা ব্রাউন! আশ্চর্য—ওথেলোর সেই অবিস্মরণীয় শব্দগুলি কানে ঢুকল কিন্তু তবু স্মৃতির ঘরের দরজা খুলল না? আশ্চর্য!

না। আশ্চর্যই বা কিসে? মদের নেশায় প্রমত্ত রিনা ব্রাউনই—সকল বিস্ময়ের সীমা শেষ। মদের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার স্মৃতি, বুদ্ধি,—বোধ হয় সমস্ত সত্তাকে।

চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে লাল সিং সসম্ভ্রমে সশঙ্ক পদক্ষেপে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফাদার ঈশ্বরকে ডাকছেন।

রিনা ব্রাউনের মূল্যের তুলনায় একদিন ঈশ্বরের মূল্যও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণস্বামীর কাছে। তখন তিনি কৃষ্ণস্বামী ছিলেন না। তখন তিনি ছিলেন কালাচাঁদ গুপ্ত। অবশ্য তখন

কালাচাঁদ ঠিক ঈশ্বর মানত না। এবং কালাচাঁদ নাম পালটে সন্তু তখন সে কৃষ্ণ ইন্দু—কৃষ্ণেন্দু হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

কাল চাঁদ কৃষ্ণেন্দুর প্রথম নাম। পাহাড়ী নদীর মত বন্য। কাল চাঁদ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করত না কিন্তু বিশ্বাস করত নিজের প্রাণশক্তিকে। বন্য পাহাড়ী নদীর মতো শুধু প্রাণচঞ্চল বেগবানই নয়—খানিকটা বর্বরও বটে। মেডিকেল কলেজে ঢুকবারও আগে।

পল্লীগ্রামের ছেলে। কালো হিলহিলে লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, কপাল পর্যন্ত পুরু ঘন চুল, মুখে-চোখে পল্লীর সারল্য। পল্লীর কর্কশতায় ঈষৎ মলিন। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণবন্ত, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। পল্লীগ্রামের নামকরা কামারের গড়া খাঁটি ইস্পাতের দায়ের মতো। ধারালো তীক্ষ্ণ অনমনীয় দৃঢ়; কিন্তু শান-যন্ত্রে ঘষা-মাজা পালিশ-করা ঝকঝকে নয়, একটু ময়লা।

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতিমান বৈদ্যবংশের সন্তান। কিন্তু সে-খ্যাতি তখন অস্তোন্মুখ। প্রপিতামহ এবং পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রসিদ্ধ ভিষগাচার্য। আয়ুর্বেদের প্রসার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। তিনি আয়ুর্বেদে মন না দিয়ে মন দিয়েছিলেন চাষবাস ও ধর্মে কর্মে। একমাত্র ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন এই বাসনা। গ্রাম্য স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কালাচাঁদ আই. এস. সি. পড়তে এল কলকাতার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে। আই. এস. সি. পাস করে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকবে। সামান্য কৌতুকে হা-হা করে হাসে, দুড়দুড় করে সিঁড়ি ভেঙে নামে, ক্লাসের শতকরা আশিটি ছেলের মাথার উপরে হিলহিলে লম্বা কালাচাঁদের মাথাটা প্রায় ছ'ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠে থাকে। অশুদ্ধ গ্রাম্য-উচ্চারণে অসংকোচে কথা বলে। অফুরন্ত কৌতূহল। অনবরত প্রশ্ন—কী? কী? কানে? কানে? কানে? তার সঙ্গে গ্রাম্য সুরের টান। শহরের ছেলেরা হাসে। কিন্তু সেসব কালাচাঁদ গ্রাহ্য করে না। সেও হাসে। কখনও কখনও গ্রামে বসে-শোনা পুরনো রঙ্গকথা বলে শোধ নিতে চেষ্টা করে।

বলে, 'তোমরা যে আমকে আঁব বলছ! তাহলে মামাকে কী বল?' বলে কটুহাসি হাসে।

হঠাৎ কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন সেন্টজেভিয়ার্সের পুরনো বাড়ি। কলেজের দক্ষিণে প্রশস্ত খেলার মাঠ। সে-মাঠে টিফিনের সময় কলেজের ছেলেরা ফুটবল খেলে। সবই কলকাতার স্কুলের ছেলে। মফস্বলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে দেখে। অন্তত গ্রাম থেকে সদ্য-আগত ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা নামতে সাহস করে না। খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাইশে আবদ্ধ থাকে না। বাইশ ছাড়িয়ে যায়। কয়েকদিন দেখে, বোধকরি মাস দেড়েক পর, আগস্ট মাস তখন, কালাচাঁদ বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গ্রাউণ্ডের ধারে দাঁড়াল। গোল-লাইনের ধারে। টিপিটিপি বৃষ্টিতে পিছল মাঠ। খেলোয়াড়রা বল মারতে গিয়ে পিছলে পড়ে পাকাল মাছের মতো চলে যাচ্ছে। হো-হো শব্দে হাসিতে ভেঙে পড়ছে দর্শক ছেলেরা। একটা সিক্সইয়ার্ড শট। গোল-কীপার বলটি ঠিক জায়গায় রেখে সরে এল। ফুল ব্যাক বল কিক করতে গিয়ে পা তুলে পিছলে পড়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। মুহূর্তে কালাচাঁদ পায়ের জুতো

খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে বলটা কিক্ করে দিল। নিপুণ খেলোয়াড়ের শক্তিশালী শট, বলটা উঁচু হয়ে গিয়ে পড়ল সেণ্টার লাইন পার হয়ে ওধারের হাফব্যাক লাইনের সামনে।

'কে হে ছেলেটা ? কে হে ?' খোঁজ পড়ে গেল। কলেজটিমের ক্যাপ্টেন থার্ড ইয়ারের আশু দাস এগিয়ে এলেন। 'কী নাম ? কোথায় খেলেছ ? কোন পজিশনে খেল ? ম্যাচ খেলেছ ?'

'হ্যাঁ, অনেক ম্যাচ খেলেছি। 'এন্তগুলান' মেডেল পেয়েছি। সিউড়ি, বর্ধমান, কাঞ্চনতলা, শান্তিনিকেতনে ম্যাচ খেলেছি। পাঁচখানা বেস্ট প্লেয়ারস মেডেল আছে। লেফট আউটে 'খেলাই'। কর্নার কিকে বল গোলে ঢুকিয়ে দোব। ফুলব্যাকেও খেলতে পারি। লেফট ব্যাক। সেণ্টারেও 'খেলিয়েছি'। গোলে পারি। দেন ক্যানে একটা কর্নার কিক্, করে দেখিয়ে দি। দেবেন ?'

'খেলাই' মানে খেলি—'খেলিয়েছি' মানে খেলেছি—ক্যানে মানে কেন—; লোকে শুনে হাসে কিন্তু কালাচাঁদ একবিন্দু লজ্জা পায় না।

'আনো তো হে বলটা ! আনো তো।'

বলেছিলেন ক্যাপ্টেন। এবং কালাচাঁদকে কর্নার কিক্ করতে দিয়েছিলেন।

কর্নার কিকে সত্যই বলটা গোলে ঢুকে গেল। একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে বলটা গোলের সামনে সিক্সইয়ার্ড সীমার ভিতরে এসে বেঁকে গিয়ে একেবারে কোণ ঘেঁষে গোলে ঢুকে গেল। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। এটা কালাচাঁদের পা আবিষ্কার করেছিল। সেণ্টজেভিয়ার্সের ক্যাপ্টেন অন্তত দেখেন নি। সঙ্গে সঙ্গে কালাচাঁদ টিমের প্লেয়ার হয়ে গিয়েছিল।

কালাচাঁদকে লেফট আউটে খেলতেও দেওয়া হল। কিন্তু হলে লম্বা কালাচাঁদ পায়ে বল নিয়ে ছুটল। সে-ছোটা তীরের মতো। একেবারে ওপারের লাইনের ধার থেকে বল মারলে। পড়ল গোলের সামনে। নিজে পা পিছলে পড়লও কয়েক বার। লোকে হাসলে। কিন্তু কালাচাঁদ সে শুনতেই পেলে না, দেখতেই পেলে না। হঠাৎ এক সময় রেগে এসে সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে বললে, 'একটা গোলে ঢোকাতে পারলেন না ? আমাকে খেলতে দেবেন সেণ্টারে ?'

কালাচাঁদ সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে এসেই বল ধরে একটু উপরে তুলে গোলকীপারের হাতে যেন ফেলে দিলে। গোলকীপার বল ধরবার জন্য হাত বাড়াল, কালাচাঁদ লাফ দিয়ে বল মাথায় নিয়ে পড়ল গোলকীপারের উপর। পড়ল দু'জনেই। কালাচাঁদের হেডে বল গোলে ঢুকে গেল।

দ্বিতীয়বারে গোলকীপার তাকে মারলে। নাক থেকে রক্ত পড়ে জামাটা ভেসে গেল।

মিনিট কয়েক মুহ্যমান হয়ে রইল, তার পরই উঠে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলো রক্ত এবং কাদামাখা হাতেই সরিয়ে দিয়ে গ্রাউণ্ডের ভিতর নেমে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন দাস তাকে হাতে ধরে বললেন, 'না, আজ আর নয়। ঘরে ঘরে মারামারি করে না।' কালাচাঁদ আশ্চর্য ছেলে! সে হেসে ফেললে। বললে, 'কী করে জানলেন আমি মারামারি করব ? ওঃ, খুব বুদ্ধি আপনার!'

হেসে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরাও তো খেলি।'

কালাচাঁদ বললে, 'তা বটে। আমাকে মারলে আমি না-ফেরে ছাড়ি না।'

কালাচাঁদ বিখ্যাত হয়ে গেল কলেজে সেই দিনই। কিন্তু ওখানেই তার খ্যাতির শেষ নেই। দিন দিন খ্যাতি তার বাড়তে লাগল। কিছুদিন, বোধ-হয় মাসখানেক পরেই, বাঙলার অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বাঙালী অধ্যাপক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক। ক্লাসের মধ্যে কে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে। সদ্য-খ্যাতি-পাওয়া কালাচাঁদ আদুরে দুরন্ত ছেলের মতো দুই ক্লাসের মধ্যে অধ্যাপকের ডায়াসে উঠে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। পিছনে একটু কথা ছিল। ক্লাসের রোল নম্বর ওয়ান, মৌলালীর কোন মুসলমান নেতার ছেলে—হাশিম, ক্লাসে দুর্দান্তপনা করে। দু'টি পিরিয়ডের মাঝখানে উঠে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ায়। অধ্যাপকদের নকল করে ভেঙায়। যা খুশি তাই বকে। বোর্ডে খড়ি দিয়ে কার্টুন আঁকতে চেষ্টা করে। একটা ক্লাউনের মতো। ছেলেরা হাসে। হঠাৎ সেদিন বাঙলার ক্লাসে হাশিম নেই, সে বাঙলা পড়ে না। কালাচাঁদ বাঙলা কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলে,

'আজি এ প্রভাতে—প্রভাত বিহগ—
কী গান গাইল রে।
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে—
ভাসিয়া আইল রে।'

তারপর বললে, 'শোনো বন্ধুগণ, বয়েজ—বয়েজ—মাই ফ্রেণ্ডস্—কমরেড্স্!'

কমরেড শব্দটা তখন এসেছে। উনিশশো আটত্রিশ উনচল্লিশ সন।

'আমি কবিতা আবৃত্তি করছি শোনো। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'।'

কণ্ঠস্বর তার ভাল ছিল না। তার উপর বয়সের গাঢ়তা কণ্ঠস্বরে তখন সদ্য সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। গলাটা তখন ভাঙা-ভাঙা, খানিকটা চেরা-চেরা। কিন্তু সে-সব তার খেয়ালও নেই, গ্রাহ্যও করে না। সব কিছুতে একটা বিশেষ শক্তিতে সে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে, ওই সঞ্চিত জলরাশির নিম্নগতি-বেগের মতো, প্রতিটি জলবিন্দুর শক্তি প্রয়োগের মতো ওর দেহমন ছুয়েরই প্রতি অণু-পরমাণু যে-কর্ম সে করে তাতেই তন্ময় হয়ে যায়। থরথর করে গলার স্বর কাঁপতে লাগল। বিদ্যুৎ-শক্তির মতো সকল শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হল সে-আবেগ।

'আজি এ-প্রভাতে রবির কর
কেমন পশিল প্রাণের পর।'

কণ্ঠস্বর তার উচ্চ হতে লাগল। আবেগ ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের মতো আবর্তিত হয়ে চলল। আগাগোড়া মুখস্থ কবিতাটি আবৃত্তি করে শেষ স্তবকে এল।

'কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে

চারিদিকে ঘোর
এ কি কারাগার ঘোর—
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর।'

বলেই সে লাফিয়ে ডায়াস থেকে নেমে এসে ক্লাসের বন্ধ দরজায় দুম-দুম শব্দে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে দিল। ছেলেরাও হাইবেঞ্চে চাপড় মারতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অধ্যাপক ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'স্ল্যাটস নট দি ওয়ে, স্ল্যাটস নট দি ওয়ে, মাই ফ্রেণ্ডস। ঝরনার জলের কারাগার ভাঙার ধারা আর মানব-হৃদয়ের পক্ষে রুদ্ধ পথের বাধা ভাঙার ধারা এক নয়। কিন্তু তুমি তো আবৃত্তি ভালো কর কালাচাঁদ!'

কালাচাঁদ আর একদফা খ্যাতি লাভ করলে।

সেবার ইণ্টার-কলেজিয়েট আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তাকে পাঠানোও হল। বাঙলা এবং সংস্কৃত প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি করলে। প্রাইজ পেলে না, কিন্তু সংস্কৃত আবৃত্তিতে সে প্রশংসা অর্জন করলে। কণ্ঠস্বর তার সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছিল, নইলে হয়তো পেত। উচ্চারণের জন্যও তার নম্বর কম হয়ে গেল।

খেলার মাঠ থেকে কলেজ পর্যন্ত, ওদিকে নামজাদা রেস্টুরেণ্ট থেকে হোস্টেল পর্যন্ত কালাচাঁদের কণ্ঠস্বরে, গতিবেগে বায়ুস্তর চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল হল। ও বললে, অন্য কলেজে চলে যাবে। কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন রেক্টরকে বলে ওকে প্রমোশন দেওয়ালেন। রেক্টর ডেকে বললেন, 'তোমাকে সাবধান হতে হবে কালাচাঁদ। তুমি তো 'ডাল' ছেলে নও। ইউ আর শার্প।'

সেদিন কালাচাঁদের মনে পড়েছিল তার বাবাকে এবং মাকে।

স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তার বাবা। পূজা আর অর্চনা নিয়ে থাকেন। মুখে-চোখে, আচারে-আচরণে একটি কী যেন আছে। যাতে তাঁর কাছে গেলেই বিনম্র হয়ে যেতে হয়। বোধ হয় একটি প্রচ্ছন্ন লজ্জার অনুশোচনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। মুখে কিছু বলেন না। শুধু গৃহদেবতার দোরে প্রণাম করবার সময় আশে-পাশে কেউ না থাকলে বলেন, 'আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভু। তোমার ভোগ কমাতে হয়েছে—এ দুঃখ আমি তোমাকে ছাড়া কাকে বলব?'

মা তার প্রসন্নময়ী। মা তার কল্পতরু। সে যখন যা চেয়েছে, তাই তিনি তাকে যুগিয়েছেন। যে যা চায়, সে তা পাবেই, সে-বিশ্বাস তার মা তাকে দিয়েছেন। অফুরন্ত দুধ ছিল তাঁর স্তনভাণ্ডে, অফুরন্ত স্নেহ ছিল তাঁর বুকে, আর ছিল মনে অফুরন্ত আশা। অবাধ এবং অগাধ ছিল তাঁর প্রশ্রয়।

তার মা তাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। তিনি নিজে সাঁতার জানতেন। যে-পুকুরে স্নান করতেন সে-পুকুরে পদ্ম ফুটত। সে রোজ আবদার ধরত ফুলের জন্য। মা তুলে এনে দিতেন। কিছুদিন পর বলেছিলেন, 'তুই সাঁতার শেখ, শিখে তুলে আন, আমি পারব না।' সাঁতার শেখার আতঙ্কে কয়েকদিন সে আর পদ্মের কথা তোলে নি। দিন কয়েক পর মা নিজেই একদিন গাছ-কোমরে বেঁধে ঘড়াটা ভাসিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আয়, পদ্ম

তুলবি।'

সে গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। আসবার সময় বারকয়েক ঘড়াটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা ধর।'

তারপর সে-ই তাঁকে নিত্য এনে দিত পদ্মফুল, গৃহদেবতার পূজার জন্য।

মা তার কাছে শুয়ে গল্প করতেন ভবিষ্যতের। 'মস্ত বড়ো ডাক্তার হবি। বিলেতে যাবি, জার্মান যাবি। মস্ত বাড়ি করবি, গাড়ি কিনবি। দাসদাসী।'

ঐশ্বর্যের গল্প করে যেতেন। অত্যন্ত সহজ মানুষ ছিলেন। দান-ধ্যান-দয়া-স্বার্থত্যাগ এসব ছিল তাঁর কাছে নিজের ভোগের পরে। নিজে রোজগার করে আগে নিজে খাব, তারপর অন্যের কথা।

সে বলত, 'বিলেত গেলে জাত যাবে না?'

'আজকাল আর সেদিন নেই। ওদে যায় যাবে। জাত নিয়ে কি তোর বাবার মতো ধুয়ে ধুয়ে খাবি?'

'বাবা মত দেবে না।'

'তুই চলে যাবি। আমরা না হয় আলাদাই থাকব। বৃন্দাবন-টন চলে যাব। তুই তো বড় হবি!'

কেন যে ওবে সেদিন তাঁদের কথা মনে পড়েছিল।

এবং সে মনে পড়াটা ভোলে নি সে। অন্তত আই. এস-সি পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত ভোলে নি সে। ফার্স্ট ডিভিশনে আই. এস-সি পাশ করেছিল।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল।

এখানে সে কালাচাঁদ গুপ্ত নয়, কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত। আই. এস-সি পরীক্ষা দেবার আগেই কোর্টে এফিডেভিট করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করে, নাম পালটে নিয়েছিল সে।

সেন্টজেভিয়ার্সের ফাদার রেক্টর তার পড়াশোনায় উন্নতিতে তার উপর খুশীই ছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'হোয়াট্স ইন এ নেম—কালাচাঁদ?'

কালাচাঁদ হেসে বলেছিল, 'কালাচাঁদ ইজ ব্ল্যাক মুন. অ্যাণ্ড কৃষ্ণেন্দু মীনস্ দি সেম—দি ব্ল্যাক মুন। আই হ্যাভ চেঞ্জড দি ওয়ার্ড ওনলি, নট দি মীনিঙ। আই অ্যাম দি সেম ওল্ড ব্ল্যাক মুন, ফাদার।'

বাবাকে, মাকেও তাই লিখে উত্তর দিল। লিখলে—'কালাচাঁদ সোনার চাঁদের চেয়েও খারাপ। আমার লজ্জা করে।'

বাবা উত্তর দেন নি, মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বেশ করিয়াছ; তাহাতে আমরা মনে কিছু করি নাই।'

কিন্তু কলেজে-কলেজে তার কালাচাঁদ নাম তখন তার নিজের মতোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাতে সে দমে নি। কেউ কালাচাঁদ বলে ডাকলেই বলত, 'নট কালাচাঁদ—আই অ্যাম কৃষ্ণেন্দু, কল মী কৃষ্ণেন্দু প্লীজ।'

এইখানেই রিনা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচয়। সেও ওই কালাচাঁদ নাম নিয়ে। রিনা ব্রাউন

কলেজের নার্স মেট্রন পলি ব্রাউনের সৎ মেয়ে। পলির স্বামী জিমি ব্রাউনের প্রথম পক্ষের মেয়ে। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার্সের মধ্যে মিসেস ব্রাউনের বাসা। রিনার বয়স তখন পনেরো-ষোল। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি তখনও কিশোরী। কিন্তু তখন থেকেই অপরূপ মোহময়ী। গায়ের রঙ সাদা হলেও বাঙলাদেশের একটি শ্যামলিমার আভাস তাতে স্পষ্ট। সবচেয়ে মোহকর মেয়েটার চুল। ছোটো কপাল ঢেকে এমন অপর্যাপ্ত পুরু ঘন কালো চুল দেখা যায় না। তৈলহীন রুক্ষতার মধ্যেও তার কালো-শোভা সুপ্ত হত না, ধূসরতার আভাস ফুটত না। কপালের উপর ঘন কালো চুলের সম্ভারের সঙ্গে এখানকার প্রান্তপ্রান্তরের প্রান্তে ঘন শালবনের শোভার যেন মিল আছে। কৃষ্ণকুন্তলার চেয়ে অলকাকুন্তলার মতো বললেও যেন ওর উপমা শোভনতর করে বলা হয়। তেমনি দুটি মোটা কালো ভুরু—কপালের মধ্যস্থল থেকে যেন আকর্ণবস্তৃত। কাঁচা বাঁশের মোটা ধনুকের মতো। অনুরূপ সুন্দর আয়ত দুটি চোখ—তাকে সুন্দরতর করেছে তার চোখের পাতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি। ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মনে হয় জন্ম থেকেই চোখের পাতায় কাজল-রেখা আর স্বপ্নালুতা মেখে নিয়ে মেয়েটি জন্মেছে। রিনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় দেখা যেত। সে সময়টাতে তখনকার দিনের মিলিটারী মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসত, ঠিক তার কিছুক্ষণ পর, বোধ হয় দশ মিনিট পর মিলিটারী ছেলের দল প্রায় সব বেরিয়ে চলে যেত। থাকত শুধু জন ক্রেটন, মিলিটারী স্টুডেন্টদের সেন্টার ফাক। মারপিটে সিদ্ধহস্ত জনি গুণ্ডা। রিনা এবং জনি—কথা বলত হাসত। রঙীন হাসি। জানত সবাই।

জন ক্রেটন। যুদ্ধবিভাগের নামকরা আই. এম. এস. অফিসারের ছেলে। চার্লস ক্রেটনের গল্প সর্বজনবিদিত—অন্তত অফিসার মহলে। কৃষ্ণেন্দু এ পরে এসব জেনেছিল ওদের কাছ থেকেই। দুঁদে অফিসার, দুর্দান্ত মাতাল, নামকরা শিকারী, ভালো নাচিয়ে, মারা-মারিতে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ছিলেন চার্লস ক্রেটন। পলি ব্রাউন বলেছিল, যেখানে চার্লস ক্রেটন থাকত, সে-ক্যান্টনমেন্টে অফিসারেরা সন্ত্রস্ত থাকত। ঝড়ের মতো পরের ঘর-সংসার ভেঙে দিয়েই ছিল তার উল্লাস। তার এই দুর্দান্তপনা মেয়েদের পক্ষে ছিল একটা আকর্ষণ। এই আকর্ষণে একদা নাকি পলি ব্রাউনও—তখন মিস পলি মরিসন—পড়েছিল। কিন্তু ক্রেটন তখন বিবাহিত। স্ত্রী ছিল ইংলণ্ডে, জন তখন শিশু। কিছুদিন মাখামাখির পর পলি মরিসন ভগ্নহৃদয়ে মিলিটারী বিভাগের কাজ ছেড়ে এসে কাজ নিয়েছিল কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। ক্রেটন সাহেব দুর্দান্ত হলেও পাষণ্ড ছিল না। কলকাতায় কাজ পেতে সে তাকে সাহায্য করেছিল। কয়েকটা বড়ো হাসপাতাল, যেগুলি ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলি ঘুরে সে মেডিক্যাল কলেজে এসে কাজ নিয়েছিল। তখন সে মিস পলি। এখানে থাকতেই সে মিসেস ব্রাউন হয়েছে। জেমস ব্রাউনকে যখন সে বিয়ে করে রিনা তখন দশ বছরের মেয়ে। জেমস আর রিনাকে নিয়ে পলি ব্রাউন সংসারে ডুবে ক্রেটনকে একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল।

কৃষ্ণেন্দু যে-বছর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হল—তার আগের বছর জন ক্রেটন এসে ভর্তি

হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজে। মিসেস পলি ব্রাউনের কাছে এসে একখানা চিঠি দিয়ে বলেছিল, 'মেজর চার্লস ক্রেটন অব দি কিংস ওন রেজিমেণ্ট, আপনার কি তাঁকে মনে আছে?'

'মেজর চার্লস ক্রেটন ডিয়ার চার্লি?'

জন হেসে বলেছিল, 'আমি তাঁর ছেলে?'

'তুমি তার ছেলে?'

'হ্যাঁ এখানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ব বলে এসেছি।'

বিস্মিত হয়েছিল পলি ব্রাউন। মেজর চার্লস ক্রেটনের ছেলে হোমে না পড়ে এখানে পড়বে ডাক্তারি। আই. এম. ডি. হবে? চার বছরে চিকিৎসাশাস্ত্র শেষ! নরুন চালিয়ে এদেশের হাতুড়েরা ফোড়া কাটে। ওরা ছুরি চালিয়ে তার চেয়ে ভালো কাটতে পারে না। আই. এম. ডি.-র ব্যবহারের জন্য ধারালো ছুরির বদলে ভোঁতা ছুরির ব্যবস্থা। কে জানে কখন ধারালো ছুরিতে বেশী কেটে ফেলে! ওদের ব্রিটিশ-আইরিশ রেজিমেণ্টে চাকরি হবে না। কালা সিপাহীর রেজিমেণ্টের মেডিক্যাল অফিসার হবে।

বিস্ময়ের অবধি ছিল না পলি ব্রাউনের। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে পলি ব্রাউন নিজেই বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ। স্ট্রেঞ্জ লাক্! কী বলব লাক্ ছাড়া?'

মেজর ক্রেটনের জীবনে বিপর্যয় ঘটে গেছে। বিচিত্র অদৃষ্টই বটে। পাঁচ বছর আগের কথা। ক্রেটন ছিল সি-পিতে একটা বড়ো ক্যান্টনমেণ্টে। তখন তার স্ত্রী-পুত্র এখানে এসেছে। ক্রেটন ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে। স্ত্রী আসায় জন্য অফিসারদের সমাজে ঘোরা-ফেরার পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ক্রেটনের স্ত্রী মার্গারেটও ছিল শক্ত মেয়ে। সাহসে, দৈহিক শক্তিতে দুইয়েই ছিল ক্রেটনের উপযুক্ত স্ত্রী। ক্রেটন সমাজ ছেড়ে মধ্যভারতের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে করেছিল শিকারের সন্ধান। শিকারের সন্ধানে বনে ঘুরবার সময় আরণ্য আদিম মেয়েদের সম্ভোগের পথটা বেছে নিয়েছিল সে। কিছুদিনের মধ্যে মার্গারেট তার আভাস পেলে। সেও একটা রাইফেল নিয়ে শিকারে তার সঙ্গিনী হল। শেষবার ঘটল বিচিত্র ঘটনা।

ক্রেটন সেই দলের লোক, যারা কোনো কথা রেখে-ঢেকে বলে না। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে নয়, জীবনের কোনো ঘটনাই তার কাছে লজ্জার হেতু নয়। পলি ব্রাউনকে লিখেছে, 'পলি, ঘটনাটা আশ্চর্য। আমার মন আমাকে ঠকালে, না এটা নিয়তির খেলা, কি আমার কর্মফলের পরিণতি, আজও ভেবে পাই না। সে এক গভীর বনে একটা গ্রাম। মার্গো সঙ্গে। সেখানে এক বিচিত্র বাঘিনীর আড্ডা। সে মারত কেবল মেয়েদের। লোকে বলত প্রেতিনী বাঘিনী। তাকে মারতে গ্রামে এসে একটি আশ্চর্য বুনো যুবতীকে দেখলাম। মন আমার বাঘিনীর চেয়ে ওর দিকেই বেশি ঝুঁকল। কিন্তু মার্গারেট সঙ্গে। যাই হোক, মাচা বেঁধে দ্বিতীয় দিন রাত্রে বাঘ মারলাম। কিন্তু বাঘিনীটা নয়। মরল যেটা সেটা বাঘ। কোথায় বাঘিনীটা! তিন দিন আর পেলাম না তাকে। কিন্তু তার পায়ের ছাপ আশ্চর্যভাবে চারিদিকে দেখলাম। যেন সামনের দিকে না এসে পিছনের দিকে সে ঘুরেছে ফিরেছে। গ্রামের

সর্দার বললে, 'ফিরে যাও সাহেব, এ বাঘিনী ভয়ঙ্কর। এ তোমার পিছু নিয়েছে।' দিনের বেলা কথা হচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে কিন্তু সেই বুনো আশ্চর্য মাদকতাময়ী মেয়েটি। সকলকে লুকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। তুমি সে-কালের চার্লিকে ভোল নি। এ-বিষয়ে সে ছিল নিপুণ শিল্পী! চার্লস ক্লেটন কি বাঘিনী পিছু নিয়েছে বলে ওই বুনো মদিরা পান না করে আসতে পারে? মার্গারেট ঠিক বোঝে নি, কিন্তু তবু সে বলেছিল, 'ফিরে চলো।' আমি বলেছিলাম, 'আজকের দিনটা দেখে যাব।' ঠিক এই সময়টিতেই বাঘিনী ঠিক গ্রাম-প্রান্তে দেখা দিয়ে একটা গর্জনে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছুটে। কিন্তু কোথায়? না-পেয়ে ফিরে আসছি হঠাৎ দেখা হল মেয়েটার সঙ্গে। ইশারায় নিমন্ত্রণ জানালে হেসে। আমি তাকে বললাম, 'রাত্রে আজ শিকারে যাব না, গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে তার ইশারা পেলে আসব।' মার্গারেটকে বললাম, 'শরীর খারাপ, মাচায় যাওয়া আজ ঠিক হবে না।' থাকলাম আড্ডায়। আড্ডা বুনোদেরই প্রধানের একখানা ঘর। মদ খেয়েছিলাম। মার্গারেটকেও খাইয়েছিলাম। তাকে ঘুম পাড়াতে হবে। সে ঘুমিয়েও ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনলাম। কান পেতে শুনলাম। আমি শিকারী। আমি জানোয়ারের পায়ের শব্দ চিনি। আমি চার্লি ক্লেটন, আমি অভিসারিকার পায়ের শব্দও জানি। এ পায়ের শব্দ সেই বুনো মেয়ের। দরজা খুললাম সন্তর্পণে। ফাঁক করে দেখলাম। চাঁদ ছিল আকাশে। বনের মধ্যে জ্যোৎস্না। আশ্চর্য তার রূপ। ঘন সবুজের ঘেরের মধ্যে সে-শুভ্রতার তুলনা খুঁজে পাই না। তার মধ্যে দেখলাম সে মেয়েকে। ভুল আমি দেখি নি। বুকের ভিতর রক্ত ছলাত করে উঠল। আমি বেরিয়ে গেলাম। শিস দিলাম। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথায় সে? ঠিক এই মুহূর্তে বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠল বনভূমি। পিছন থেকে বাঘিনী লাফ দিয়ে পড়ল আমার উপর। একটু সরতে পেরেছিলাম, তবু সে আমার ডান কাঁধের উপর পড়ল। সেই মুহূর্তে শুনলাম মার্গারেটের চিৎকার। তার পর মুহূর্তে শুনলাম বন্দুকের শব্দ। পর পর দুটো শব্দ। আবার বাঘের গর্জন। তারপর মনে নেই, জ্ঞান হল হাসপাতালে দীর্ঘদিন পর। ডান হাতখানা কেটে ফেলতে হয়েছে। ডান কানটা নেই। ডান পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। তাতেও জোর নেই। বাঘিনী মার্গারেটকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে মরেছিল। দুটো গুলিই লেগেছিল তার বুকে পেটে। মরবার সময় গড়াগড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল আমার উপরেই। আলিঙ্গন করেছিল। আরও মজার কথা কী জান? সেই বুনো গ্রামে ওই মেয়েটার সন্ধান কেউ আমাকে আর দিতে পারে নি। আমি খোঁজ করেছিলাম। তারা বলে, 'কই, এমন মেয়ে তো গাঁয়ে নেই!' আজও আমি ভাবি কী জান? ওই মেয়েটা কি প্রথম থেকেই আমার মস্তবিহ্বল মস্তিষ্ক এবং আমার নারীলোলুপ চিত্তের ভ্রান্তি? অলীক কল্পনা? যাই হোক, আজ আমি বিকলাঙ্গ অসহায়, সামান্য পেনসনের উপর নির্ভরশীল সামান্য ব্যক্তি। জনিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে পড়াবার সামর্থ্য নেই। ও কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। আমি জানি তুমি ওখানকার মেট্রন। জনিকে একটু দেখো।'

ভগবানের নাম উচ্চারণ করে পলি ব্রাউন গায়ে ক্রশচিহ্ন এঁকেছিল। 'হে ভগবান! পুয়োর চার্লি শয়তানের হাতে পড়েছিল। কিন্তু তুমি বসো জন। তুমি মেজর চার্লস ক্লেটনের ছেলে। মেজর ক্লেটন এক সময় আমার বস্ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে অবারিত রইল। যখন খুশি আসবে।'

আলাপ করিয়ে দিয়েছিল স্বামী জেমস ব্রাউনের সঙ্গে। জেমস ব্রাউন এক সময় মেদিনীপুর অঞ্চলে থাকত। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ জমিদারি কোম্পানিতে কাজ করতেন জেমসের বাবা। সেখানে পাহাড় জঙ্গল কিনে ব্যবসা করতেন। জেমস ব্রাউনও সেই ব্যবসা করত। ব্যবসা ফেল পড়ার পর ইনসলভেন্সি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মেয়ে রিনাকে নিয়ে। তারপর দেখা হল পলি মরিসনের সঙ্গে। সে আজ চার বছরের কথা।

'রিনা বড়ো ভালো মেয়ে।'

ডবল বেণী দুলিয়ে রিনা বসে মিষ্টি হাসি হেসেছিল।

'ওর বাবা ঠিক করেছিল, ওকে কনভেন্টে রেখে শেষ পর্যন্ত 'নান' করে তুলবে। জিনির ধর্মকর্ম বাতিক। কনভেন্টে রেখেও ছিল। আমি নিয়ে এসেছি জোর করে। দেখ তো কী মিষ্টি স্বভাব মিষ্টি চেহারা।'

জন ক্লেটনের সঙ্গে রিনার প্রেমের কথা কলেজে কিছু দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। জন ক্লেটনের সঙ্গে ফুটবলের মাঠে কৃষ্ণেন্দুর হল একদিন মারপিট। সেই সূত্র ধরে নয়—সেই সূত্রের টানেই যেন রিনা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণেন্দুর সামনে।

মিষ্টি স্বভাবের রিনা ব্রাউন ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিন কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল 'ইউ ব্ল্যাকি কালাচাঁদ! ইউ হিদেন!'

কৃষ্ণেন্দু কলেজের ভিতর খেলার মাঠে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিজয়ী বীরের মতো এসে সবে নেমেছে, ছেলেরা তাকে উল্লাস-করতালি অভিনন্দন জানাচ্ছে। রিনা ব্রাউন ওদের ক্লাস থেকে রাগে ফুলতে ফুলতে নেমে এসে গ্রাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে ডেকেছিল, 'ইউ ব্ল্যাকি কালাচাঁদ! ইউ হিদেন!'

ওর পিছনে পিছনে এসেছিল ওর আয়া। একটি কটা এদেশী মেয়ে। মাথার চুলগুলি পেকে গিয়েছে। মোটা ভুরু। অদ্ভুত লাগত তাকে দেখে। তার অদ্ভুত ছিল চোখের দৃষ্টি। সর্বদাই যেন আতঙ্কে বিস্ফারিত এবং পলক পড়ত না। সে পিছন থেকে চিৎকার করছিল—'রিনা, রিনা, রিনা, রিনা! নহি! নহি!'

রিনা থামে নি। সে পা ঠুকে বলেছিল, 'ইউ, শুনতে পাও না তুমি?'

কালাচাঁদ তার কাছে এসে বলেছিল, 'হর্ষায় ভিজে কাদার উপর এমন করে পা ঠুকো না। তোমার এমন স্কার্টটা কাদার ছিটেতে ভরে গেল।'

সত্যিই তাই গিয়েছিল। ছেলেরা হেসে উঠেছিল। রিনার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল সে-হাসির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে। কথার উত্তর খুঁজেও পায় নি, সরাসরি সে অভিযোগ করে বলেছিল, 'কেন তুমি জনিকে এমন করে মেরেছ? হোয়াই? ইউ ব্রুট!'

সে উত্তর দেবার আগেই কলেজ টীমের ফুলব্যাক বসন্ত বলেছিল, 'ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা

দেখছ না? জনিই মেরেছিল ওকে আগে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার বাগদত্তা নেই মিস ব্রাউন, থাকলেও সে এসে জনিকে এ-প্রশ্ন করত না। সে জানে লড়াই আরম্ভ হলে যার জোর বেশী, তার আঘাতটা জোরালো হবেই। কীচকেরা চিরকাল ভীমের হাতে মরে।' ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

ওই আয়া মেয়েটি হঠাৎ হাত জোড় করে কৃষ্ণেন্দুকে পরিষ্কার বাংলায় বলেছিল, 'হে বাবা। দয়া-(দোহাই) তুমার পিতিপুরুষের, হেই ভালোমানুষের ছেল্যা, আমি হাতজোড় করছি। ঘাট মানছি। উকে কিছু বল নাই। হেই বাবা!'

মেয়েটা বাঙালী! সেই বিস্ময়েই সকল ছেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রিনা এই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিল, 'ইউ উইল বি পানিশ্‌ড, গড উইল পানিশ ইউ।'

*　　　　*　　　　*

ঘটনাটা সব মনে পড়ছে। সে খেলা ঐতিহাসিক খেলা। খেলা নয় যুদ্ধ।

কলেজের ভিতরের খেলার মাঠে খেলার অধিকার নিয়ে সাধারণ ছাত্র আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিলিটারী ছাত্রদের ঝগড়া, মারপিট-ভরা সে-যুদ্ধের কথা কলেজের ইতিহাসে লেখা আছে। সেই যুদ্ধ চলেছে তখনও। যুদ্ধের সেই মেলা সেদিন চলেছিল খেলার মাঠে। তার আগের দিন দুই দলের ম্যাচে জনিই একা করেছিল মারপিট। সেদিন শোধ নেবার জন্যে শপথ নিয়ে নেমেছিল কৃষ্ণেন্দু। জনকে সে মারবে। বুটের সুযোগ তো ওদের চিরদিনের, তার উপরে জনি মারপিটে সিদ্ধহস্ত। জনি শুনে হেসেছিল। বেচারা জনি, কৃষ্ণেন্দুকে ঠিক জানত না। কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর ছ-ফুট-লম্বা চেহারাখানা দেখে একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া গত দু-বছরে কালাচাঁদের খেলার পার্টির উপরেও শ্রদ্ধা করে মারবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। প্রথমেই সেণ্টার হাফ জনি বুটের লাথি মেরে জখম করেছিল এদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে। বেচারার ডান হাঁটুর নীচে কাপ জখম হয়। উঠল বটে, কিন্তু তখন ছুটবার ক্ষমতা গিয়েছে। তার পরই ওদের সেণ্টার হাফের পায়ের বুড়ো আঙুল ফাটিয়ে দিলে। রেফারি তাকে সাবধান করে দিলেন। জনি সরে এসে রেফারিকে গাল দিলে 'সন অব এ বিচ' বলে। কথাটা কানে গেল কৃষ্ণেন্দুর। সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে নিজের জায়গায় দিয়ে সে এল সেণ্টার ফরওয়ার্ডে, দাঁড়াল জনির মুখোমুখি।

জনি হেসে বললে, 'You are কালাচাঁদ? দ্যাটস্‌ অলরাইট। বহুৎ আচ্ছা ব্লাকি। কাম অন।'

কথাটা শেষ হতে না হতে বল এসে পড়ল দুজনের মধ্যে। জনি বুট ঝাড়লে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে। কালাচাঁদ সুকৌশলে হাঁটু বাঁচিয়ে জনির উৎক্ষিপ্ত পাখানার তলার দিকে ঝাড়লে একখানি কিক। ছ-ফুট-লম্বা মানুষের শক্ত বাঁশের মতো পায়ের সে কিকে চিত হয়ে পড়ে গেল জনি। এবং হাঁটু বিনা রক্তপাতে জখম হল। ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠল জনি; এবং কিছুক্ষণ পরই জনি মারলে ওর মাথায়। কৃষ্ণেন্দুর মাথাটা ফেটে গেল। রক্তমাখা বড়ো চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কৃষ্ণেন্দু মিনিট দুয়েক পরেই ছুটল বল ধরতে। জনি প্রাণপণে

ছুটে এসে রুখলে। বল তখন কৃষ্ণেন্দু ইন্সম্যানকে দিয়ে সামনে ছুটেছে। উঁচু বল এসে পড়েছে। জনি কৃষ্ণেন্দু সামনাসামনি, দুজনেই হেড দিতে লাফাল। কৃষ্ণেন্দু হেড দিলে, মর্মান্তিক আর্তনাদ করে জনি পড়ল মাটির উপর কাত হয়ে পেট চেপে ধরে, অজ্ঞান হয়ে গেল। ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেতে হল তাকে। পেটের অন্ত্রে আঘাত লেগেছে। এর পর কৃষ্ণেন্দু করলে হ্যাটট্রিক।

দেশী ছেলেদের কাঁধে চড়ে কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে গান ধরেছে—

দিন আগত ঐ—ভারত তবু কই—
সে কি রহিবে লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে ?
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে—জাগ্রত ভগবান হে।
জয় ভৈরব !

এই মুহূর্তেই রিনা ব্রাউন এল—'ইউ ব্ল্যাকি কালা'চাও!' এবং শেষ পর্যন্ত বললে, 'গড উইল পানিশ ইউ।'

কৃষ্ণেন্দু তারও উত্তর দিয়েছিল, উত্তর দিতে একটু দেরি হয়েছিল ওই আয়াটির মুখের আকুতিভরা বাঙলা কথা শুনে। বিস্মিত হয়ে আধ মিনিট দেরি হয়েছিল, চিৎকার করেই সে বলেছিল, 'হ্যালো মিস, হ্যালো। লেট হিম বি ইওর গড—তোমার ভগবানকে বলো—আমার সামনে আবির্ভূত হতে। কিংবা আমাকে তার সামনে হাজির করাতে। জান, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমার একটা পরম লাভ হবে। আমি তাঁকে দেখতে পাব। তার জন্যে দরকার হয় তো বলো, তোমার জনিকে আমি গুলি করে মারব!'

* * *

রিনা ব্রাউন! আমার দম্ভ চূর্ণ করে তোমার ঈশ্বর আমাকে দণ্ড করেছেন। তোমার ঈশ্বরকে আমি দেখেছি রিনা ব্রাউন। কিন্তু আশ্চর্য! ডাইনী অপবাদে অপরাধিনী আদিম আরণ্য নারী ওই বুড়ির মধ্যেও তাঁকে দেখেছি। দেখেছি! সিন্ধু, লাল সিং, এদের মধ্যেও তাঁকে পেয়েছি। তোমার সঙ্গী ওই মরণ-পথ-যাত্রী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় আমেরিকান অফিসারটির মধ্যে তাঁকে দেখলাম, তিনি রয়েছেন। যুদ্ধে যে প্রাণ নেবে তার মধ্যে নয়, যুদ্ধে প্রাণ দেবে বলে এতদূরে এসেছে তার মধ্যে যে তাঁকে আমি দেখলাম! কিন্তু তোমার মধ্যে থেকে তিনি কোথা অন্তর্হিত হলেন, রিনা ব্রাউন! হে ঈশ্বর! সেই মেয়েটিকে তুমি কেন পরিত্যাগ করলে!
এ রিনা ব্রাউন ঈশ্বর-পরিত্যক্ত রিনা ব্রাউন! কৃষ্ণস্বামী মনে মনেই কথা ক'টি বললেন।

'বাবাসাহেব!' সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সিন্ধু।

'কে? সিন্ধু?'

'হাঁ বাবাসাহেব। চা দিয়ে গেলম, খেলে নাই। রাত কত হইছেক—ভুখ্‌টা কি তুমার লাগে না বাবাসাহেব?'

'আমার রুটি ঢাকা দিয়ে রেখে যাও সিন্ধু। ইয়ার পর যখন হোক খাব।'

'উঁহু। আপনি খেয়ে লও—তবে আমি যাব।'

'না সিন্ধু! আজ আমাকে ছাড়ান দাও বেটি।'

'শরীর কি ভালো নাই বাবা?'

'শরীর ভালো আছে বেটি। মন ভালো নাই।' বলেই উঠে পড়লেন কৃষ্ণস্বামী। ঘর থেকে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বারান্দা থেকে নামলেন খোলা উঠানে।

চার পাশে বর্ষার ঘনশ্যাম শালবনে জ্যোৎস্নার আভা প্রতিফলিত হয়েছে। দূর দিগন্ত পর্যন্ত বনের মাথায় মাথায় চলে গেছে। নিঃশব্দ নয়, নিস্তব্ধও নয়। কিন্তু যেন থমথম করছে। গাছে গাছে কুঁড়িগুলি পরিপুষ্ট হচ্ছে। কাল সকালে ফুটবে। পরশু যারা ফুটবে তারা বাড়ছে। আজ সকালে যারা ফুটেছিল, তাদের গন্ধ এখনও ছড়িয়ে রয়েছে বাতাসে। মাটির গভীর অন্ধকারে মূল পচনরস পান করছে কৃমির মতো লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্মাগ্র মুখ বিস্তার করে। অবিরাম চলেছে বিচিত্র জীবনতপস্যা। পঙ্করস পুষ্প হয়ে ফুটেছে।

রিনা ব্রাউন মদ খেয়ে হয়তো নাচছে বা চিৎকার করছে, হয়তো আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে বিকৃত লালসায় উন্মত্ত বাভিচারে নিজেকে ক্ষয় করছে। বস্তুজগতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকেরা বলে সেটা আকস্মিক ঘটনা। তা থেকেই জেগেছিল প্রাণ। সেই প্রাণের জাগরণেই ঈশ্বরের তপস্যার হেমকুণ্ড জ্বলছে। অনন্ত প্রাণের সমিধের আহুতি চলেছে তাতে। প্রাণে তেজ হল। 'তুমি তাতে কালি হয়ে ঝরে পড়লে, রিনা ব্রাউন! এমন কী করে হল?' তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করছে।

এগিয়ে চললেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর আশ্রমের সীমানা পার হয়ে বনের দিকে চললেন। বনের মধ্যে গাছেরা যেন কথা বলছে। বাতাসে, পাতায় পাতায় সাড়া জেগেছে, সুর জেগেছে। সারাটা দিন ওরা মানুষের জীবভক্ষক প্রাণের খাদ্য অক্সিজেনের ভাগ নিয়েছে। এইবার অক্সিজেন দিচ্ছে। রিনা তুমি দিনরাত্রিই কার্বনডায়োক্সসাইড গ্রহণ করছ, সারা দিন রাত্রি কার্বনডায়োক্সসাইড দিচ্ছ। লয়ের মধ্যেও বিচিত্র সৃষ্টি আছে। রিনা তোমার মধ্যে শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়, শুধু ক্ষয়।

'বাবাসাহেব! ফাদার!'

বাঙলোর দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। যোসেফ লাল সিং ডাকছে। তিনি বনের দিকে চলেছেন, তাই শঙ্কিত হয়েছে। বনে ভালুক আছে। বুনো শুয়োর আছে। মধ্যে মধ্যে চিতা আসে। সেই ভয়ে তাঁকে ফিরে আসতে বলছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'বেশী ভিতরে আমি যাব না যোসেফ।'

'না, বাবাসাহেব, গাঁ থেকে লোক এসেছে।'

লোক! তা হলে কারও বাড়িতে অসুখ! বিপদ! ঈশ্বর কি রিনার কথা ভাবতে নিষেধ করছেন? ফিরলেন কৃষ্ণস্বামী। বারান্দায় বসে আছে—একক্রোশ দূরের একখানি ছোটো গ্রাম থেকে, কৃষ্ণস্বামীর চেনা সবাই। এ যে বুড়ো শরণ লায়েক।

'কী হল লায়েক মশয়? এত রাতে?'

'কী হবেক? বিপদ! তা নইলে তুমার কাছে আসব ক্যানে এত রেতে!'

'কার অসুখ? কই জানি না তো কিছু?'

'জানবা কী? এই আমার ছেল্যাটার বড়ো বিটিটো। পেথম পোয়াতি বটেক। সেই

দুপুর থেকে বেথা উঠেছে। দাইটো এই রেতে বলে, 'আমি খালাস করতে লারব লায়েক; গতিক মন্দ বটেক লাগছে। তুমি বাবাসাহেবকে খবর দাও।' মেয়্যাটা গোঙাইছে বাবা। শুনতে পারা যেছে না। যেতে একবার হবেক বাবা।'

'নিশ্চয়! হবেক বই কি।' কৃষ্ণস্বামী দ্রুতপদে উঠে গেলেন ঘরের ভেতরে। ডাকলেন, 'যোসেফ। তুমি চলো। যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যাগটা গুছিয়ে লাও হে। তোমরা আলো আন নাই লায়েক?'

'না গো বাবা, ত্যাল কুথাকে পাব গো। একটো কানাকুঁজো হ্যারিকল আছে—তা সিটা দিলাম ঘরে। তা আকাশে জোস্তা রইছে—ঠিক চলে যাব।'

'আমাদের একটা হ্যারিকেন নাও লাল সিং। ব্লেসেড ইজ হি দ্যাট কামেথ ইন দি নেম অফ দি লর্ড। চলো লায়েক।' থাক রিনার কথা। রিনা মৃত। ঈশ্বর তার কথা মনে করতে নিষেধ করছেন।

চার

অথচ রিনা তাঁকে লিখেছিল। একদিন 'উম আনটু ইউ।' শেষ চিঠি তার। 'কৃষ্ণেন্দু, তুমি আমার কাছে মৃত। ডেড টু মী।'

পরদিন সকালে শরণ লায়েকের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন কৃষ্ণস্বামী। প্রায় সারা রাত্রি পরিশ্রম করে শরণের নাতনীকে প্রসব করিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ভোরের শালবনে এখনও রাত্রিচরদের আনাগোনা স্তব্ধ হয় নি। পাখিরাও বাসা ছাড়ে নি, কলরব শুরু করেছে শুধু। ফুলেরাও সবে ফুটছে। মাথার উপরে আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে, বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলোতে চলেছে, আর পাক খাচ্ছে একসঙ্গে সরালি হাঁস। ভোরের বাতাস ক্লান্ত শরীরে বড়ো ভালো লাগছে। সাইকেলটা থাকলে বড়ো ভাল হত। ফিরতে ফিরতে ওই কথাটা মনে পড়ল। মনে পড়েছে কাল রাত্রেই। কিন্তু এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল। অন্য কোনো চিন্তার অবকাশ ছিল না। আবার অতীত কথা, রিনার কথা মনে পড়েছে। হে ঈশ্বর! মার্জনা করো তুমি। যাকে ভালোবাসে মানুষ—তাকে ভুলতে পারে না। পারে না। পারে না।

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেন্দু রিনাকে ভালোবেসেছিল। রিনাও ভালোবেসেছিল। দুজনের বিরোধের মধ্যে আশ্চর্যভাবে সেতু গড়ে উঠেছিল। ভাবলে আজও মনে হয় পরমাশ্চর্য! রিনা ওকে দেখলেই বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলত, 'ইউ হিদেন!'

কৃষ্ণেন্দু তখন ধর্ম ঈশ্বর কিছুই মানে না, তা হিদেনইজম্। ম্যাটার আর মাইণ্ডের সংজ্ঞাকে মেনে সে নূতন যাত্রা শুরু করেছে। তবু তাকে হিদেন বললে, তার গায়ে লাগত। কিন্তু সে সত্য অর্থে নয়-বলে নয়, গায়ে লাগত এদেশের মানুষ ব'লে। মেয়েটার উপর একটা শোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ আবেগে ঘুরে বেড়াত। সামান্য সুযোগে

বিচিত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসত। এমনি একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

এই ঘটনার মাসখানেক পরে। সেপ্টেম্বরের শেষে, মেডিক্যাল কলেজের ওদের টীম জিতে নিয়ে এল কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের সবথেকে বড়ো শীল্ডটা। সেবারকার খেলায় কৃষ্ণেন্দুই ছিল সবচেয়ে ভালো প্লেয়ার। মেট্রন পলি ব্রাউনের ভারি শখ ছিল খেলা দেখার। কলেজের টীমের খেলা থাকলে সেই অজুহাত নিয়ে সে ঠিক গিয়ে তার শখের হাতপাখা নিয়ে সামনেই চেয়ারে বসত। পাশে থাকত রিনা। কৃষ্ণেন্দু যেন রিনার উপরে শোধ তুলবার জন্যই এমন উন্মাদের মতো দুর্দান্ত বিক্রমে খেলত। রিনা সত্যসত্যই রাগত। কৃষ্ণেন্দুকে হিদেন বলার ঝোঁক তার বাড়তে লাগল। শীল্ড জিতে কলেজে এসে সেদিন ছেলেরা কৃষ্ণেন্দুকে কাঁধে নিয়ে নাচছিল। রিনা বেরিয়ে এল বারান্দায়। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দুর কী মনে হল, রিনা হিদেন বলে সম্বোধন করবার আগেই সে চিৎকার করে উঠল, 'জয় কালী!' বলেই জিভ কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। রিনা ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেদের দল হো-হো করে হেসে উঠল।

এরপর, রিনাকে দেখলেই কৃষ্ণেন্দু চিৎকার করে উঠত, 'জয় কালী!'

রিনাও বলত, 'হিদেন!' প্রথম দিন হতভম্ব হয়ে ঘরে ঢুকলেও, পরে আর হতভম্ব হত না রিনা।

আবার ঘটল আর একটি ঘটনা।

মাস কয়েক পর বড়দিনের সময় মিলিটারী স্টুডেন্টদের সোস্যাল ফাংশন হল। তার মধ্যে ছিল কয়েকটা সিলেক্টেড সীন। একটি সীন ছিল 'ওথেলো' থেকে। 'ওথেলো আর ডেসডিমোনা। 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ মাই সোল' দিয়ে আরম্ভ ডেসডিমোনাকে হত্যার দৃশ্য। জন ক্লেটন করেছিল ওথেলো, এবং কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে ডেসডিমোনার অংশে অভিনয় করেছিল রিনা। ক্লেটনের ওথেলো ভালো হয় নি, কিন্তু চেহারা ও মিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য এবং বিশেষ করে সহজ অভিনয়ের জন্য রিনার অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল। কৃষ্ণেন্দু দেখেছিল এই অভিনয়। এর পর এ তার বেরাল হল, সে ওথেলো নাটকের ওই দৃশ্যটা মুখস্থ করে ফেললে এবং যখন-তখন 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ' বলে সলিলকিটুকু আবৃত্তি শুরু করে দিত। রিনা তিক্ত হয়ে এরপর কৃষ্ণেন্দুর সামনে বের হওয়া ছেড়ে দিলে। তবুও কৃষ্ণেন্দু শূন্য বারান্দার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করত, 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ।'

এর পর হঠাৎ একটি ঘটনায় সব কিছু উলটে গেল। নাটকীয় ভাবে নয়—অত্যন্ত সাধারণ ভাবে—স্বচ্ছন্দ গতিতে। আগে সেই পরিবর্তনের সময় কৃষ্ণেন্দুর কাছে বিস্ময়কর বলে অবশ্যই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ—?

বনপথে চলতে চলতে প্রসন্ন ম্লান হাসি ফুটে উঠল কৃষ্ণস্বামীর মুখে। কিসের বিস্ময়, কোথায় বিস্ময়ের কারণ? মানুষের মধ্যে প্রাণ-ধর্মের এই স্বভাব। এই তো ঈশ্বরের তপস্যা মানুষের দেহের বেদীতে। গুণের আসরে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা যেমন তার স্বভাব, প্রতিযোগিতার পর গুণগ্রাহিতাও তার তেমনি প্রকৃতি-ধর্ম।

পাস আর্টের পর পরের বছর ফুটবলের সময়। ইন্টারভারসিটি শীল্ড কম্পিটিশনে মেডিক্যাল টীম যাবার কথা ঠিক হল — আই. এস-সি. এবং এম. বি. কোর্সের ছেলেদের মিলিত টীম। ক্লেটন এবং কৃষ্ণেন্দু দুজনেই নির্বাচিত হল। সিলেকশন হওয়ার পরই দুজনের দেখা হল সিঁড়িতে। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যালো!' দুজনেই একসঙ্গে হাত বাড়ালে, পরস্পরের হাত চেপে ধরলে। দুজনেই বললে, 'তুমি থাকলে আমি ভাবি না।'

টুর্নামেন্টে ওরা ফাইনাল পর্যন্ত গিয়ে হল, ফাইনালে হারল। খেলাটা হয়েছিল বম্বেতে। ফিরে যখন এল, তখন ওরা দুজনে দুজনের অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

ফিরে এসে ক্লেটনই ওকে নিয়ে গেল পলি ব্রাউনের বাড়ি। চল এবার রিনার সঙ্গে মিটমাট কর। সে বেচারার অত্যন্ত দুঃখ সে তোমার কাছে হেরেছে। পলি ব্রাউন ভারি খুশী হয়েছিল। এই দুর্দান্ত ছেলেটির কলেজে সর্বজনপ্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হত। এবং কলেজের সর্বজন থেকে কেও আলাদা নয়। সে তাকে সংবর্ধনা করে বলেছিল, 'ওথেলো, দি টার্বুলেন্ট মূর।' তারপরেই হেসে বলেছিল, 'ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ। তুমি ওটা বেশ বল। আমার ভালো লাগে। কিন্তু রিনাকে চটাবার জন্য কেন বল? ইউ নটি বয়?'

রিনা তখন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল। ক্লেটন বলেছিল, 'লেট বাইগন্স বি বাইগন্স। শেক হ্যান্ডস ইউ টু, অ্যান্ড বি ফ্রেণ্ডস।'

কৃষ্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'আমি ক্ষমা চাইছি।'

রিনা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরে বলেছিল, 'উই আর ফ্রেণ্ডস।'

আলাপের মধ্যে হঠাৎ পলি ব্রাউন এসে বলেছিল, 'ওটা তুমি একবার আবৃত্তি করো। "ইট ইজ দি কজ, ইট ইজ দি কজ।" ওথেলো। সত্যি ওটা তুমি ভালো কর। তোমার হোর্স ভয়েসে অ্যান্ড—অ্যান্ড—ইউ ক্যান পুট ডাইভিং ইমোশন ইন ইট।'

রিনা বলেছিল, 'অ্যান্ড—' বলেই চুপ করেছিল।

ক্লেটন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী?'

রিনা হেসে বলেছিল, 'তোমার থেকে অনেকটা বেশী ওথেলোর মতো। টল, মোর মূরলাইক, ইজ্‌ন্ট ইট?'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কিন্তু তোমার চেয়ে ভালো ডেসডিমোনা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার মনে হয় পারফেক্ট।'

ক্লেটন বলেছিল, 'তা হলে তোমরা দুজনে গোটা সীনটা করো। লেট আস এনজয় অ্যান্ড মেক দি মেমরি অব দি ফার্স্ট মীটিং আনফরগেটেবল। থাক চিরস্মরণীয় হয়ে আজকের এই পরিচয়ের স্মৃতি।

জেমস ব্রাউন একবার এসেই চলে গিয়েছিল। লোকটা অদ্ভুত। অদ্ভুত ঠিক নয়, ও সেই সব ইংরেজের একজন, যারা এদেশের এক-একজন ছোটখাট লাট-সাহেব। কালা মানুষদের সঙ্গে কথা কইতেও ঘেন্না। এবং গোঁড়া ক্রিশ্চান হিসেবে হিদেনদের ছুঁলে হাত ধোয়। নিঃস্ব, তাই নিঃশব্দে থাকে।

রিনা ব্রাউন সাহেবের ঘরের দিকে তাকিয়েই আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু ক্লেটন ব্রাউনের কাছে গিয়ে অনুমতি আদায় করে এনেছিল। ব্রাউন সাহেব প্রশ্ন করেছিল, 'শুধু ভালো ছেলে, কলেজে পড়ে না ভালো ঘরের ছেলে!'

ক্লেটন বলেছিল, 'বোধ।'

'তা হলে অবশ্য অনুমতি দিতে পারি। উঁচু জাত? ওদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। হি ইজ এ গুপ্টা। উই হ্যাভ সো মেনি গুপ্টাজ অ্যাযজস্ট আওয়ার প্রকেসরস।'

'ইয়েস, ইয়েস, আই নো। গুপ্টাজ আই নো। ইয়েস।'

অনুমতি দিয়েছিল ব্রাউন সাহেব।

ওরা গোটা সীনটাই আবৃত্তি করেছিল। একটা কাণ্ড ঘটেছিল শেষের দিকে। ডেস-ডিমোনাকে হত্যা করবার সময় সে যখন 'ইট ইজ টু লেট' বলে তার গলা টিপে ধরার অভিনয় করছে, রিনা যখন 'ওহ্ লর্ড লর্ড লর্ড' বলে কাতর চিৎকার করছে, তখন সেই মুহূর্তে সেই আয়াটি 'রিনা রিনা' বলে আর্তনাদ করে ঘরে এসে ঢুকে কৃষ্ণেন্দুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে ধরেছিল—ছেড়্যা দাও। ছেড়্যা দাও! ই— যেন একটা বিষণ্ণ কুকুর হিংস্র হয়ে উঠেছে।

চমকে উঠে সরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণেন্দু।

রিনা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু, রিনা সান্ত্বনা দিয়েছিল পরিষ্কার মেদিনীপুর-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের খাস বাঙলা-ভাষায়।

'মিছা-মিছা; ই সব মিছামিছি; ই সব থিয়েটারের বক্তৃতা!'

ও ঘর থেকে জেমস ব্রাউন এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। ভয়ার্ত পশুর মতো স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে-মেয়েটা শুরু মূক হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত মূক থেকে চিৎকার করে উঠেছিল,—আমার—আমার—মেয়েটাকে—।

'নিকালো, ই ঘরসে নিকালো ইউ বিচ, গেট আউট!' ব্রাউন ক্ষেপে পড়েছিল রাগে। কৃষ্ণেন্দু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। মেয়েটির হাত ধরে রিনাই এ ঘর থেকে ওর ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। পলি ব্রাউন সামলেছিল জেমস ব্রাউনকে।

ক্লেটন হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দুকে; 'ভাট নেটিভ ওম্যান রিনাকে এক মাস বয়স থেকে মানুষ করেছে। অত্যন্ত ভালোবাসে রিনাকে। ওকে অপছন্দ করেন না—বাট, ইউ সি, হি ডাজ নট লাইক ইট। মিস্টার ব্রাউন অকৃতজ্ঞ নন, তিনি ওকে তাড়িয়ে দিতে চান না; দেনও নি; কিন্তু ওই যে মায়ের মতো ভালোবাসতে চায়, নিজের মেয়ের মতো দেখতে চায়, সে উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ইউ নো, মিস্টার ব্রাউন ইজ এ পাক্কা সাহিব। শুধু তাই নয়, ব্রাউন একজন গোঁড়া ক্রিশ্চানও বটে।' সেই মুহূর্তেই রিনা ফিরে এসেছিল।

রিনার সে-ছবি এখনও মনে আছে। একবার তাকাচ্ছিল, যে ঘরে ওই মমতায় আবদ্ধ, মূক পশুর মতো তার ওই ধাত্রী আছে সেই ঘরের দিকে, আবার তাকাচ্ছিল বাপের দিকে। হঠাৎ সে এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরের দিকে।

পলি ব্রাউন ফিরে এসে কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত গুপ্টা। তুমি এটা মনে

রেখো না। তুমি জান না। মেয়েটা বড়ো আনক্লীন ইন মাইণ্ড। এবং কিছুটা আউট অব মাইণ্ড। পাগল খানিকটা। রিনা ঘুমোয় আর ও তুক-তাক করে। একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'খুব খুশী হয়েছি। আর কি সুন্দর আবৃত্তি করলে তুমি! আবার এসো। প্লীজ। প্লীজ, ডু কাম।'

* * *

ক্লেটনের সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্কটাই ছিল গায়ের জোরের ব্যাপার নিয়ে। ওদের হোস্টেলে গিয়েই পাঞ্জা কষা থেকে শুরু হত। ঘরে ঢুকেই হাতখানা বাড়িয়ে বলত, 'কাম অন্!'

তারপর নানান রকমের প্রতিযোগিতা চলত। এবং যেটি বিস্ময়কর মনে হত ক্লেটনের কাছে, সেইটি সে পলি ব্রাউনের বাড়িতে কৃষ্ণেন্দুকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাবার করিয়ে তবে ছাড়ত।

শুকনো নারকেল শুধু হাতের জোরে ছাড়িয়ে মাথায় ঠুকে ভেঙে খাওয়া দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'পাথর?'

'না। কাটলে রক্ত পড়ে।' হেসে বলেছিল কৃষ্ণেন্দু।

একদিন পঞ্চাশটা সিদ্ধ ডিম খাওয়ার পরিচয়ও দিয়ে আসতে হল ব্রাউনদের বাড়িতে।

এরই মধ্যে কখন যে রিনা এবং সে, বান্ধবী এবং বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল, তার সঠিক দিনটি নির্ণয় করা কঠিন। তবে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল এই বন্ধুত্ব, হঠাৎ কোনো এক-দিনের আকস্মিক ঘটনার ফলে বা এক-দিনের আকস্মিক কোনো আবেগের উচ্ছ্বাসে নয়। অত্যন্ত সহজভাবে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে। এই ফুল ফোটার মতো।

হ্যাঁ, ফুল ফোটার মতো। ফুল যেদিন ফোটে, সেদিন সূর্যোদয়ের আগেও তার বর্ণ-গন্ধের ঘোষণা কাউকে ডাক দেয় না। যখন ফোটে, তখন তার বর্ণশোভা গন্ধের নিমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি করেই পরস্পরকে ওরা জানলে একদিন।

ক্লেটন দু-বছর ফেল করে যখন পাশ করে বের হল, তখন কৃষ্ণেন্দুর সিক্সথ্ ইয়ার। কৃষ্ণেন্দু তখন শুধু খেলার আসরেই খ্যাতিমান নয়, শুধু ছাত্রাবস্থাতেই সর্বজনপরিচিত নয়, বিদ্যার ক্ষেত্রেও তার জীবন-দীপ্তি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। চিকিৎসার কয়েকটা পদ্ধতিতে তখনই সে পাকা চিকিৎসকের মতো নিপুণ হয়েছে। কলেরায় স্যালাইন ইনজেকশন এবং ইনট্রাভেনাস ইনজেকশনে সে পটুত্ব অর্জন করেছে। সে-পটুত্ব এমন যে, কলেরা কেসের 'কলে' নাম-করা ডাক্তারেরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ইনজেকশন সে-ই দেয়। ডাক্তার উপস্থিত থাকেন। তাতে তার উপার্জন হয়। সালভারসন ইনজেকশন দেবার জন্য তো তখন সে সদ্য-পাশ-করা বন্ধু ডাক্তারের নামে একটি চেম্বার খুলেই বসেছে। এতে ক্লেটন তাকে সাহায্য করেছিল অনেক। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মহলে ওকে পরিচিত করে দিয়েছিল। ক্লেটন ওকে তখন স্যুট পরা ধরিয়েছে। ধুতি-কামিজ-পরা ডাক্তারের কাছে এরা আসতে চায় না। অর্থের অভাব হত না। নিজেই রোজগার করত।

ক্লেটন পাশ করল। ওদের পাশ করলেই চাকরি। নূতন চাকরি নিয়ে চলে যাবে। মিলিটারী স্টুডেন্টরা বিদায়ী দলকে অভিনন্দন জানালে। ক্লেটনের উদ্যোগেই ওথেলোর সেই

দৃশ্যটি অভিনীত হল। তারই প্রস্তাবে কৃষ্ণেন্দু ওথেলো ডেসডিমোনা রিনা।

ওই অভিনয়ের মধ্যেই কৃষ্ণেন্দু আবেগপ্রখর চাপা গলায় যখন ঘুমন্ত ডেসডিমোনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আই উইল স্পেয়ল দী অন দী ট্রী—' তখনই সে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে কালা আদমি, অভিনয়ে ক্লেটনের আগ্রহে ওথেলোর পার্ট পেয়ে থাকলেও ডেসডিমোনা রিনা ব্রাউনকে চুম্বনের অধিকার তার ছিল না। আত্মহারা আবেগ সত্ত্বেও ওখানটায় সংবরণ করলে নিজেকে, কিন্তু—

So sweet was ne'er so fatal. I must weep.

But they are cruel tears. The sorrow's heavenly.

বলতে বলতে তার বড়ো চোখ দুটি থেকে জলের ধারা নেমে এল। কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে আসছিল, কোন রকমে সে শেষ করলে,

It strikes where it doth love. She wakes.

রিনা ব্রাউন চোখ বুজেও অনুভব করছিল সেই আবেগের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখলে কৃষ্ণেন্দুর চোখে জলের ধারা। সে অভিভূত হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে সে অনুভব করলে আরও কিছু। প্রখর স্পষ্ট হয়তো নয়, তবু অন্ধকারাবৃতের মতো অব্যক্ত নয়। কুয়াশার মধ্যে বর্ণের আভাসের মতো অস্পষ্ট। অস্পষ্ট থাকলেও তফাত থাকে নি পরস্পরের কাছে। এরপর দুজনের দেখা হলেই একটা কম্পন বুকের মধ্যে অনুভব করত।

রিনা কৃষ্ণেন্দুকে পরে বলেছিল কথাটা। রিনা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিল না, কৃষ্ণেন্দুই যুগিয়ে দিয়েছিল। 'তুমি বলছ অন্ধকার কেটে গিয়ে কুয়াশার মধ্যে রামধনুর রঙের আভাসের মতো? জান তো কালো কোনো রঙ নয়, কালো হল রঙের অভাব, বর্ণশূন্যতা।'

রিনা বলেছিল, 'দ্যাটস রাইট।' বলেছিল, 'তারপর তুমি যখন বললে, থিঙ্ক অব দাট সিনস, আমি বললাম—দে আর লাভস আই বেয়ার টু হিউ, সেই মুহূর্তে আমারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।'

অভিনয়ের শেষে কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলেই চলে গিয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে নি। সাতদিন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণেন্দু কেমন হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন আগে লেখা বাবার চিঠিখানা বার বার পড়ত আর ভাবত। বাবা কলকাতায় এসেছিলেন হঠাৎ। এক মাসের উপর সে চিঠি দেয় নি। চিন্তিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। আরও একটা কারণ ছিল। ওদের গ্রামের হরিবিলাস বসু কলকাতায় থাকেন, তিনি দেশে গিয়ে বলেছিলেন, 'ছেলে যে সায়েব হয়ে গেল শ্যামসুন্দরকাকা। কোটপ্যান্ট পরে সায়েব-মেমের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেস্টুরেন্টে টেবিলে বসে খাচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

বাবা পরদিনই কলকাতায় এসে ধর্মতলার চেম্বারে উঠেছিলেন। ওই ঠিকানাই সে ইদানীং ব্যবহার করত মেসের ঠিকানার পরিবর্তে। বোধ হয় ওর মধ্যে প্রতিষ্ঠার একটা প্রচ্ছন্ন মোহ বা অহংকার ছিল। সুবিধে ছিল—চিঠিপত্র পেতে গোলমাল হত না।

'কৃষ্ণেন্দু তখন চেম্বারে একটি ফিরিঙ্গী মেয়েকে ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন দিচ্ছে, তার সঙ্গের

আর একটি মেয়ে বাইরে বসে আছে। আর দুটি রোগী অপেক্ষা করছে। সবই সালভারসনের কেস। এদিক দিয়ে এদের মানসিকতা বৈজ্ঞানিক। এরা লজ্জা করে না। এসে সোজাসুজি বলে, 'ওয়েল ডক, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এবং সন্দেহের কারণও আছে যে, আমার খারাপ অসুখ হয়েছে। দেখ তো অনুগ্রহ করে।' এবং যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে চিকিৎসা সুশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা চলে যায়। এদেশের লোক শুধু গরীবই নয় কৃপণও বটে। ডাক্তারের ফি নিয়েও দর করে। ফাঁকিও দেয়।

মেয়েটির ইনজেকশন শেষ করে চেম্বার থেকে বেরিয়েই সে বাবাকে দেখেছিল। মেয়েটি তখনও টেবিলে শুয়ে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

'বাবা!' বাবাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে।

'হ্যাঁ। এক মাসের উপর আটত্রিশ দিন চিঠি দাও নি। চিন্তিত হয়ে এসেছি।' বাবা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন পড়তে চেষ্টা করেছিলেন।

'আমি তো চিঠি দিয়েছি।'

'আমরা তো পাই নি।'

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, একখানা পত্র লিখেছিল ডাকে দেবার জন্য। চেম্বারে ঢুকে ব্লটিং প্যাডটা তুলে চিঠিখানা বের করেছিল। পরাধীন ঘরোয়া চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, 'কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, ফেলা হয় নি।'

বাবা বিচিত্র হাসি হেসেছিলেন। তারপর ও সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এরা সব?'

'রোগী।'

'রোগী? তুমি—?'

'একজন ডাক্তার বন্ধু চিকিৎসা করেন এখানে। তাঁকে সাহায্য করি। আপনার আশীর্বাদে আমি পাশ-করা ডাক্তারের চেয়ে ভালো ইনজেকশন দিই।'

এই সময়ে এসেছিল রেটন এবং রিনা। 'হ্যালো ম্যান—'

কৃষ্ণেন্দু তাড়াতাড়ি তার বাবার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, 'রেটন ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনি আমার বন্ধু। আমাদের কলেজেই পড়েন, জন রেটন, আর ইনি রিনা ব্রাউন। বন্ধু আমার।'

'গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান!' রেটন সত্যিই খুশী হয়ে বেশ সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছিল।

রিনা একদৃষ্টে তাঁকে দেখেছিল।

বাবা আর থাকেন নি—চলে গিয়েছিলেন; দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন। কালীঘাটে তিনি চলে গেলে রিনা বলেছিল, 'হি ইজ এ ট্রু হিন্দু, এ টিপিক্যাল ব্রাহ্মিন। আমার ভারি ভালো লাগলো। কী মিষ্টি কথা! আণ্ড ইউ, টারবুলেণ্ট যুবা, এ রায়ট র, হিজ সন!' তারপরই বলেছিল, 'কি নাম বল তো সেই ব্রাহ্মণের ছেলের—যে বিদ্রোহ করে দেবতা ভেঙেছিল? ইয়েস। কালাপাহাড়—ব্ল্যাক মাউণ্টেন!'

হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু। কৃষ্ণেন্দুই ওদের কাছে কালাপাহাড়ের গল্প বলেছে।

পরদিন হাওড়া স্টেশনে সে বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিল। বাবা কথা কমই বলেন, ট্রেনে চড়ে একটি কথাও বলেন নি। ট্রেন ছাড়বার সময় শুধু বলেছিলেন, 'সাবধানে চলো।'

হাসি পেয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর। সাবধানে চলতে হবে? কেন? বাড়ি গিয়ে চিঠি লিখেছিলেন বাবা। লিখেছিলেন, 'ইচ্ছা ছিল আসিবার সময় তোমার সম্মুখেই সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আসি কিন্তু 'সাবধানে চলিবে' এই কথা ছাড়া কোনো কথা বলিতে পারি নাই। পত্রেও সকল কথা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াও লিখিতে কেমন যেন বাধা অনুভব করিতেছি। তোমার মাকেও এসব কথা বলিতে পারিতেছি না। তাহা হইতে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। মনে হইতেছে উচিত হইবে না। তুমি উপযুক্ত পুত্র। বিদ্যাবুদ্ধিতে তুমি যখন সুখ্যাতি পাইতেছ, তখন কী করিয়া মন্দ বলিব? কিন্তু তবু বলিতেছি, আমার ভালো লাগিল না। মনে হইতেছে, ভালো হইবে না। যেন বড়ো বেশী আগাইয়া যাইতেছ। আমাদের শাস্ত্রে বলে, উপনয়নের সময় তিন পায়ের বেশী অগ্রসর হইতে নাই। তাহাতে আর ফিরিবার উপায় থাকে না। আমার মনে হইতেছে, তিন পায়ের বেশীই অগ্রসর হইয়াছ তুমি। অপর দিকে বলে, সাত পা একসঙ্গে পথ হাঁটিলে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম, কলিকাতায় তুমি অনেক পা অনেকের সঙ্গে হাঁটিয়াছ। সাত পা কিনা জানি না। সপ্তপদ পূর্ণ না হইয়া থাকিলে আর আগাইও না। গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন। সপ্তপদ পূর্ণ হইয়া থাকিলে তিনি যেন আর দুইপদ তোমাকে আগাইয়া দেন।'

চিঠি পেয়েও কৃষ্ণেন্দু হেসেছিল। বাবার অমূলক আশঙ্কায় না হেসে করবে কী? আর আশঙ্কা অমূলক না হলে পাথরের গোবিন্দের রক্ষা করবার শক্তিই বা কোথায়? কিন্তু এই ঘটনায়, অর্থাৎ ক্লেটনদের বিদায়-উৎসব উপলক্ষে থেলোর অভিনয়ের মধ্যে আকস্মিকভাবে নিজের যে প্রকাশ তার নিজের কাছে ঘটল, তারপর আবার চিঠিখানা খুলে বার বার না-পড়ে সে পারে নি। কয়েকদিন পরে পেয়েছিল মায়ের চিঠি। তার অভয়দায়িনী উদারদৃষ্টি মা। মা লিখেছেন—'তোর বাবা ভয় পেয়েছেন। তিনি রাগ করলে আমি বুঝতাম হয়তো সহ্য করতে পারছেন না তোর সত্যকে, বুঝতে পারছেন না তোর ন্যায়কে—তাই রাগ করছেন। কিন্তু ভয় যখন পেয়েছেন তখন যে চিন্তা আমারও হচ্ছে কালো। ওরে তুই নিজে হিসেব করে দেখিস।' তা সে করেছিল—নিজেই হিসেব করেছিল, ক-পা সে ছেড়ে এসেছে, ক-পা এগিয়েছে রিনার সঙ্গে। হিসাব করতে বসে আবার মনের জোর ফিরে পেয়েছিল।

ইস্কুল এক পা, সেণ্ট জেভিয়ার্স এক পা, মেডিকেল কলেজ এক পা। তিন পা হয়ে গেছে। সে জানে উপনয়নের সময় দু-পায়ের পর শেষ পা ফেলার সময় পিতা বা উপনয়নদাতাই পাখানি ধরে পিছিয়ে দেন। ঘরে সংসারী হয়ে আবদ্ধ হয়, বদ্ধ অবস্থাতেই জীবন কেটে যায়। মানুষের প্রাণ বদ্ধ জলার মতো বাষ্প হয়ে পুনর্জন্মের জলধারা হয়ে ঝরে প্রবাহের কামনা করে। সে যদি নদীর স্রোতের গতি পেয়ে থাকে, তবে তাতে খেদের কি আছে? হ্যাঁ সে গতি সত্যিই সে পেয়েছে, অনেকদূর চলে এসেছে। তাকে রক্ষা করবার জন্য গোবিন্দের প্রয়োজন নেই। পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দের নাগালের বাইরে সে।

গোবিন্দ সজীব সত্তা হলে সে তাকে মানবে। তার সামনে গিয়ে তবে দাঁড়াবে।

কল্পনায় গোবিন্দকে সে তো মানে না! বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যে তার সম্মুখে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। তার কোনো পথই তো পুরাণের বৈকুণ্ঠের দিকে যায় নি।

আর রিনার সঙ্গে? কত পদ? কত পদ হল?

যত পদই হোক—সপ্তপদ হয় নি। এবং ওপথে আর পদক্ষেপ করবে না স্থির করেছিল, কারণ—রিনা, ক্লেটনের মনোনীত বধূ। ক্লেটন তার বন্ধু! এখানে সে বাবা-মার চিঠি না-মেনেও সাবধান হল। পরদিন থেকে রিনাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিলে। রিনাই চিঠি লিখলে। ও তার জবাব দিলে, 'জনি ছিল, জনির সঙ্গে যেতাম। জনি চলে গেছে। আমার সামনে পরীক্ষাও বটে। জনি ফিরে এলে যাব। আমার দোষ নিয়ো না।' জন ক্লেটন চলে গেছে মিলিটারী ট্রেনিংয়ে।

* * *

'বাবাসাহেব!' অতীতকালের স্মৃতিকথাকে ডুবিয়ে দিয়ে বর্তমান যেন কথা কয়ে উঠল। কে তাঁকে ডাকলে।

'কে!' থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর অসুখ নাকি?

'ই সকালে পয়দলে কুথাকে যাবেন গো? সাইকেল কী হল?'

গোনো গ্রাম থেকে মাথায় কলসী এবং পাটের শাকের বোঝা নিয়ে কয়েকজন লায়েক চলেছে বিষ্ণুপুরের দিকে। পথে বাবাসাহেবকে দেখে স্মিতহাস্যের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো প্রশ্ন করছে।

পথ ভুল হয়ে গেছে কৃষ্ণস্বামীর। বনের মধ্যে পথ-ভুল একটা সাধারণ ব্যাপার।

নিজের আস্তানার পথ ফেলে অনেকটা চলে এসেছেন। বন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। বন শেষ হলেই একেবারে বিষ্ণুপুরের প্রান্তভাগে উঠবেন। একেবারে যমুনা বাঁধের কাছাকাছি।

থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

ফিরবেন এখান থেকে? না।

একবার যাবেন লাল বাঁধের ধারে। লাল-বাঁধের পাড়ের উপর সেই পাথরখানাকে স্পর্শ করে যাবেন, যেখানার উপর রামকৃষ্ণ পরমহংস বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

মনের মধ্যে অবাধ্য স্মৃতির পীড়ন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মুছে যাক, অতীত কালের সব স্মৃতি মুছে যাক। পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়; ওই বৈরাগীশ্রেষ্ঠের আসনখানার স্পর্শে তাঁর মন বৈরাগ্যে ভরে উঠুক। বৈরাগ্যের গেরুয়ার ছাপে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার রামধনুর সাত রঙ নিঃশেষে ঢেকে থাক।

পাঁচ

মহাপুরুষের স্পর্শ মহাপুরুষের সঙ্গেই চলে যায়। অন্তত বস্তুজগতে থাকে না। বস্তুজগতের ধরে রাখবার শক্তি নেই। থাকলে মিশরের ফারাওদের মন্দিরের কল্যাণেই পুরনো মিশর বেঁচে থাকত। বুদ্ধের অস্থির উপর স্তূপের কল্যাণে ভারতবর্ষে সকল দুঃখ দূরে যেত। ঈশ্বরের পুত্রের আবির্ভাবের পর প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে মিলে ইয়োরোপ জুড়ে এক অপরূপ প্রেমের রাজ্য গড়ে উঠত। এমন ভাবে ইয়োরোপই বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে উঠত না।

থাকে মহাপুরুষের স্মৃতি আর বাণী। মানুষের মনে মনে বয়ে চলে,—নদীর মতো। কিন্তু মনে যখন সংশয়ের ঝড় ওঠে—কোথা কোন্ দূর দিগন্ত থেকে বালি এসে জমা হয়, বা প্রখরতম গ্রীষ্ম জেগে ওঠে—মরুভূমি হয়ে ওঠে মন, তখন সে-নদীর স্রোত শুকিয়ে যায়। শুষে নিয়ে, উত্তপ্ত বালুর চড়ার মতো খা-খা করে।

ঠিক তেমনি ভাবে কৃষ্ণস্বামীর মন প্রখর তৃষ্ণায় হাহাকার করছে। কোনোক্রমেই তিনি রিনা ব্রাউনের কথা ভুলতে পারছেন না। কী করে পারবেন? এই রিনা দেখে সেই রিনাকে ভুলবেন কী করে? মরুভূমির মধ্যে যে নদীটি আগে বইত—তার স্মৃতি কি ভোলা যায়?

বিষ্ণুপুরের লাল-বাঁধের ধারে পাথরখানিকে ছুঁয়ে বসে ভাবছিলেন কৃষ্ণস্বামী।

মনে পড়ছে রিনার সেই মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো মূর্তি। দীর্ঘ পল্লবের ঘেরের মধ্যে জলভরা বড়ো-বড়ো দুটি চোখ। সজল চোখে কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ইউ আর হার্টলেস, ইউ আর হার্টলেস কৃষ্ণেন্দু! আই ডিড নট নো। নেভার থট দ্যাট ইউ ক্যান্!' কথাটা রিনা বলেছিল—কৃষ্ণেন্দুর মাতৃবিয়োগের পর। ছবিটা জ্বলজ্বল করছে।

মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছিলেন। কৃষ্ণেন্দু টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়ে তাঁকে দেখতে পায় নি; পনের-কুড়ি দিন পর শ্রাদ্ধশান্তি সেরে কামানো মাথা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিল। বন্ধুরা জানত। কিন্তু রিনাকে বলে যাবার কথা মনে হয় নি। কারণ এর মধ্যে কয়েক মাসেই খানিকটা দূরে চলে এসেছিল সে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় মনোজগতে রিনার কাছ থেকে দূরে সরেছিল সে সুকৌশলে। ডাক্তার সে। একালের ডাক্তারিতে মানসতত্ত্বও পড়তে হয়। একনাগাড়ে নব্বুই দিন মনকে বেঁধে রাখলে, দূরে সরিয়ে রাখলে মনের আকর্ষণের সূত্র ক্ষীণ-জীর্ণ হয়। বন্ধুর বধূ সম্পর্কে আসক্তিহীন হবার জন্যই সে সংকল্প করে তা-ই করেছিল। রিনা ক্রেটনের মনোনীতা। তারও বাবা-মা আছেন। হাসপাতালে পলি ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হত, তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু তাও যথাসাধ্য কম, রিনার কথা তুলতই না। মাতৃশ্রাদ্ধ সেরে ফেরার পর তার কামানো মাথা দেখে পলি ব্রাউন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কী হয়েছে কৃষ্ণেন্দু? এনি মিস্‌হ্যাপ?'

'আমার মা—'

'মারা গেছেন? বাবা-মা মারা গেলে তোমরা মাথা কামাও?'

'হ্যাঁ মিসেস ব্রাউন। আমার মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। আমি দেখতেও পাই নি।'

পলি ব্রাউন পরমাত্মীয়ার মতোই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। সন্ধ্যায় সে ধর্মতলার বন্ধুর চেম্বারে বসে আছে, এমন সময় এল রিনা। চোখে জল নিয়ে সে তাকে তিরস্কার স্বরে অনুযোগ জানালে, 'তুমি হৃদয়হীন কৃষ্ণেন্দু। আমি জানতাম না। ভাবি নি কখনও।'

'বোসো রিনা।'

'না। এই কটা কথাই বলতে এসেছিলাম। তোমার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সেদিন একটা খবরও দাও নি? এত পর ভেবেছ?'

তার হাত ধরে তাকে খাটকে কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি।'

তখন বসেছিল রিনা। সেদিন শুধু তার মায়ের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং কৃষ্ণেন্দু সত্যসত্যই কেঁদেছিল, 'মায়েদের কথা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে রইল রিনা। তোমার পবিত্র হৃদয় স্বর্গের মতো। তার স্পর্শে আমার মন জুড়িয়ে গেল।'

একটুখানি হাসি ফুটে উঠেছিল রিনার মুখে। বেদনায় ম্লান, কিন্তু শান্ত। বলেছিল, 'সত্যি, মায়ের স্নেহ আমি কখনও পাই নি কৃষ্ণেন্দু। মামি পলি আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু তার চেয়েও গাঢ় ভালোবাসার স্বাদ পাই আমি কুন্তীর কাছে। ভাবি, ও শুধু আমাকে মানুষ করেছে। আমার আয়া। তাহলে সত্যিকারের মায়ের স্নেহের স্বাদ কেমন?' রিনা চলে গেলে কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে ছিল কৃষ্ণেন্দু। এই ঘটনা থেকেই আবার রিনার সঙ্গে যোগসূত্র নতুন হয়ে উঠল। সূত্রটা হয়তো ছিল না, কালের স্রোতে মাত্র কয়েক মাসেই জীর্ণ হয়ে যাবার মতো উপাদানে তৈরী ছিল না। ওটা ছিল সোনার মতো ধাতু থেকে গড়া। হাজার বছর পরেও মাটির তলা থেকে ওঠা সোনার অলংকারের মতো হাজার বছর আগের দুটি হৃদয়ের যোগাযোগের সাক্ষ্য দেবে।

খাঁটি সোনা। কোন খাদ ছিল না।

আবার হঠাৎ একদিন। সেদিন হাসপাতাল কম্পাউন্ডে ঢুকেছে, কুন্তী—রিনার আয়া—ছুটে এসে তাকে বললে, 'ডাক্তারবাবু!'

অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি এমন যে যেন কথা কইতো। বুকের ভিতরে রাগ হোক, হিংসা হোক, ভয় হোক, আতঙ্ক হোক, সে যেন আপনার রূপ নিয়ে স্পষ্ট ফুটে বের হ'ত। কুন্তীর চোখে সেদিন ছিল আতঙ্ক আর আকুতি। দৃষ্টি থেকেই সে বুঝলে কিছু ঘটেছে।

কৃষ্ণেন্দু তখন সদ্য পাশ করেছে। হাউস-সার্জন হয়ে রয়েছে। তার কল্পনা—সে বিলেত যাবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই টাকা সে সংগ্রহ করতে পারবে। টাকা তার কিছু আছে। মা তাঁর মৃত্যুকালে গহনাগুলি তাকে দিয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধের পর তার বাবা তার হাতে সেগুলি দিয়ে বলেছেন—তুমি নিয়ে যাও। রাখ। আমার খরচের হাত। পাশ করে তুমি ডিসপেন্সারি করবে বলেই সে দিয়ে গেছে। তা ছাড়াও কলেরার চিকিৎসায় স্যালাইন

ইনজেকশনে এরই মধ্যে তার খ্যাতি যথেষ্ট হয়েছে এবং সাহস তার অপার। সেদিকে তার উপার্জনের পথ প্রশস্ত। পাশ যতদিন করে নি, ততদিন অন্য ডাক্তারের পিছনে তাকে যেতে হত। এবার সে একলা যাবার অধিকার অর্জন করেছে। এবং এ-দেশের বড়লোকের বাড়িতে দুষ্ট খাবারের প্রবেশাধিকার আজও অবাধ এবং তাদের গণ্ডেপিণ্ডে খাবার প্রবৃত্তিও প্রচণ্ড। কলকাতা শহরে মাছিরও অভাব নেই। ভ্যাকসিনও এরা নেয় না। ওদের বাড়িতে মোটা টাকা উপার্জনের পথ তার অবারিত। ধর্মতলার চেম্বার ছাড়াও চিৎপুর অঞ্চলে একটা চেম্বার করেছে। সালভারসন ইনজেকশনে নাম সব থেকে বেশী। ধর্মতলায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা লজ্জা না-করে চিকিৎসা করায়। চিৎপুর অঞ্চলে, যারা লজ্জা করে সংগোপনে চিকিৎসা করাতে চায়, তাদের জন্য চেম্বার। এখানে চার টাকার জায়গায় আট টাকা ফী। রিনার কথা গোপন অন্তরে আছে কিন্তু তার খবর রাখে না। বিদেশে চলে যেতে চায়।

কুন্তী সভয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল, 'রিনা কাঁদছে ডাক্তারবাবু।'

'কাঁদছে?'

'ফুলে ফুলে কাঁদছে। সকাল থেকে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'জানি না, জনি সাহেবের বাবার কাছ থেকে কী চিঠি এসেছে সাহেবের কাছে। আমি জানি না, ওরা বলছে।'

কৃষ্ণেন্দু না-গিয়ে পারে নি। রিনা সত্যই পড়ে পড়ে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দু যেতেই সে একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'আমি কী করব কৃষ্ণেন্দু?' এবং আবার সে ফুলে ফুলে কেঁদে চলেছিল।

জনির বাবা চার্লস ক্লেটন চিঠি লিখেছে ব্রাউন সাহেবকে: 'আপনার চিঠি জন পেয়েছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সত্যকারের একজন ইংরেজ এবং ক্রিশ্চান; আমিও তাই। জনিও ক্রিশ্চানের ছেলে ক্রিশ্চান। রিনাকে বিবাহ করা নিয়ে সে যখন আপনাকে একখানা চিঠি লিখতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই আপনার চিঠি সে পায়। জন যে-কথা আপনাদের জানাতে চেয়েছিল, সে-কথা আমি জানাই। যাচাই না হলে প্রেমের ঠিক মূল্য বোঝা যায় না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, রিনার সঙ্গে মেলামেশার স্বরূপকে সে অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছে। বন্ধুত্বকেই সে প্রেম বলে ভুল করেছিল। জন এখানে এসে চাকরি নিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে তার প্রকৃত ভালবাসার পাত্রীর সন্ধান পেয়েছে। কর্নেল রেমণ্ড আমার পুরনো বন্ধু। পলি তাঁকে জানে। তাঁর মেয়ে এমিলি। এমিলি রেমণ্ড অত্যন্ত ভালো এবং সুন্দরী মেয়ে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে এবং শীঘ্রই তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হবে। এ পুয়োর গার্ল ইন ডিসট্রেস ইজ এ সেক্রেড থিং; রিনা দুঃখ পেলে তার জন্য আমার গভীর সহানুভূতি রইল। সময়ে সবই সেরে যাবে। রিনার সম্পর্কে যে সত্য আপনি তাকে জানিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি একজন খাঁটি ক্রিশ্চান।'

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। ক্লেটন সম্পর্কে মনে একটা আঘাত পেয়েছিল। একটা

দুরন্ত ক্ষোভ জেগে উঠেছিল তার। সে আজ এখানে থাকলে—। কৃষ্ণেন্দু খোলা জানালা দিয়ে কলকাতার বাড়িগুলোর মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। ক্লেটন এমন পাষণ্ড!

'আই গেভ হিম মাই এভরিথিং কৃষ্ণেন্দু।' রিনা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল এবার।

'রিনা! কেঁদো না। রিনা! লুক অ্যাট মী, ইন মাই ফেস্—রিনা!'

রিনা তার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। মৃদু বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, 'তুমি যদি আজ আমাকে ওথেলোর মত গলা টিপে মেরে ফেলতে পার কৃষ্ণেন্দু!'

এক মুহূর্তে কী হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাঁধকে টলতে টলতে হেলে ঢলে সশব্দে ভেঙে ভূমিসাৎ হতে কেউ দেখেছে? ঠিক তেমনিভাবে বাঁধ ভেঙে পড়ল আর উন্মত্ত জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো জীবনের সকল আবেগ যেন মুহূর্তে মুক্তিলাভ করল। 'রিনা—রিনা—আমি তোমাকে ভালবাসি, কথা কটি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে উন্মাদের মতো রিনার বুকের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'রিনা, আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা! রিনা! মাই লাভ। আমার সব। রিনা! আমি তোমাকে ভালবাসি।'

মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে রিনা শুধু বলেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু! মাই কৃষ্ণেন্দু!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রিনা!'

সে শুধু বলেছিল—'কৃষ্ণেন্দু—মাই কৃষ্ণেন্দু! মাই কৃষ্ণেন্দু!'

তারপর মুখের উপর মুখ রেখে দীর্ঘক্ষণ তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পর কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি আর দেরি করতে চাই না। যত শিগ্‌গির হয় বিয়ে করতে চাই। কাল এসে আমি তোমার বাবা-মাকে বলব।

পরের দিন কৃষ্ণেন্দু গিয়ে বলেছিল ব্রাউন সাহেবকে।

ব্রাউন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ইউ সি মিস্টার গুপ্ত, আমি একজন ইংরেজ। তার চেয়েও বেশী, আমি একজন ক্রিশ্চান। আমার মেয়ে রিনা অবশ্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তার মধ্যে কিছুটা এদেশের রক্ত আছে, কিন্তু সে আমার মেয়ে। আজকালকার দিনের মতো তিন আইনে রেজেস্ট্রি করে বিয়েতে আমি রাজী নই। সেও হবে না। সে আমার চেয়ে বেশী ক্রিশ্চান ধর্মে অনুরাগী তোমাকে আমি জানি। তুমি কৃতী মানুষ। সাহসী এবং সৎ লোক। বিয়েতে আমার অমত নেই, কিন্তু তোমাকে ক্রিশ্চান হতে হবে।'

ক্রিশ্চান হতে হবে! স্তম্ভিত হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। এতটা ভাবে নি সে। ধর্ম—সে মানে না। সেখানে ধর্মান্তরের কথা হয়তো কিছুই নয়। তবু একটা যেন প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলে।

'ভেবে দেখো, ইয়ং ম্যান! কাল এসে উত্তর দিয়ো। কাল না পার কয়েকদিন পর।'

কৃষ্ণেন্দু মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে ফিরছিল। রিনার ঘরের দোরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। রিনার দরজা বন্ধ। সে ডেকেছিল, 'রিনা!'

ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি যাও, তুমি যাও। আমি ভাবি নি। আমি এ-কথা ভাবি নি। গো ব্যাক কৃষ্ণেন্দু, গো ব্যাক।'

'রিনা!'

'না! না। না! করগেট মি। গো ব্যাক।'

সে চলে এসেছিল। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে কুন্তী। সে কাঁদছিল। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে বলেছিল, 'রিনা মরে যাবেক—ডাক্তার বাবা—রিনা মরে যাবেক।'

পৃথিবী ঘুরছিল। আকাশ-মাটি, ঘর-বাড়ি, মানুষ—সব যেন পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটা অসীম শূন্যতায় ভরে যাচ্ছিল তার মন। সব শূন্য, সব শূন্য। রিনা ছাড়া আজ আর সে পৃথিবীতে বাঁচবার কল্পনা করতে পারে না। ধর্ম? ধর্ম তো সে মানে না। সত্যই মানে না। ঈশ্বরও মানে না। সে মানে নূতন কালের নূতন সত্যকে। ঈশ্বর নেই, এই সত্যই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য। ট্রুথ ইজ গড—সত্য যদি ভগবান হয়, তাহলে সব ধর্মই আজ সমান মিথ্যা তার কাছে। তবু একটাকে অবলম্বন করে থাকতে হয়েছে তাকে। সে মানে না, তবু তাকে লোকে বলে হিন্দু বৈদ্য। তাকে কাগজে লিখতে হয়, ফর্ম পূর্ণ করতে হয়। কিন্তু আজ রিনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য। তার জন্য সে হবে, ক্রিশ্চানই হবে। তার বাবা—!

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা তার হাহাকার করে উঠল।

বাবা। তার বাবা! বাবা কি এটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারবেন? কিন্তু ক্রিশ্চান হয়েও কি সে তাঁর সন্তান থাকতে পারবে না? তাঁর ধর্ম নিয়ে তিনি থাকবেন। তাঁর আচার-আচরণ সমস্ত কিছুকে সে আজ শ্রদ্ধা করে, তেমনি করবে। সে তো কোনো ধর্মের আচরণের মধ্যে নিজের জীবন-সত্যকে সন্ধান করবে না, সে সন্ধান করবে তার ধর্ম এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে চিকিৎসক-জীবনের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। তবে কিসের বিরোধ, কিসের সংঘর্ষ? তবে সে ক্রিশ্চান শুধু নামে রিনার জন্য! দূরান্তরেই সে থাকে, বাবা থাকেন গ্রামে। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাকে তাঁর প্রয়োজন কতটুকু? সেবার? সেবা সে করবে। তিনি ছোঁবেন না? তাঁকে ছোঁবেন না, রিনাকে ছোঁবেন না? কেন ছোঁবেন না! কেন?

অর্ধোন্মাদের মতো সে বেরিয়ে এল। তার অন্তর থেকে দেহের অণু-পরমাণু চিৎকার করছিল, "রিনা—রিনা—রিনা!' রিনাকে ভিন্ন সে বাঁচতে পারে না। এ তার দেহলালসা নয়। সে বার বার পরীক্ষা করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু। অনেক অনেক বেশী।

হাসপাতাল থেকে শরীর অসুস্থ বলে সে চলে এল। ছোটো একটা ব্যাগে সামান্য কটা জিনিস নিয়ে হাওড়ায় ট্রেনে চেপে বসল। বাড়ি পৌঁছে দাঁড়াল বাবার সামনে।

'তুমি হঠাৎ!' বাবা চমকে উঠলেন। এ কি চেহারা?

'আপনার কাছে এসেছি। অনুমতি চাইতে এসেছি। আমি একটি ক্রিশ্চান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

বাবা চমকে উঠলেন না। চিৎকার করলেন না। তার মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমতো

শান্তভাবেই বললেন, 'এ আমি জানতাম।'

বাবার পা দুটো ধরে উপুড় হয়ে পড়ে কৃষ্ণেন্দু উন্মাদের মতো বলেছিল, 'আপনি বলুন।'

বাবা বলেছিলেন, 'তুমি উন্মাদ। নইলে আমার পায়ে ধরে লজ্জাহীন হয়ে এ-কথা বলতে পারতে না যে একটি ক্রিশ্চান মেয়ের জন্য আমার ধর্ম তুমি ত্যাগ করবে।'

'তাকে ভিন্ন আমি বাঁচব না।'

'তুমি মরে গেলে আমি আত্মহত্যা করব, এ-কথা আমি বললে মিথ্যা বলা হবে কৃষ্ণেন্দু। আত্মহত্যা আমি করব না, কষ্ট নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু বাঁচব, ভগবানের নাম করে বাঁচব। আমার ধর্মে আত্মহত্যা অধর্ম।'

সে চীৎকার করে উঠেছিল, 'বাবা!'

বাবা শান্ত স্বরে বলেছিলেন, 'উত্তর আমি দিয়েছি কৃষ্ণেন্দু। ওই মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার কাছে তুমি মৃত, মেয়েটিকে না পেলে মরে যাবে বলছ তো। আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'আর এগিয়ো না।' তুমি শোন নি। এক সঙ্গে জীবনের অংশভাগী করে সাত পা যদি হেঁটে থাক, তা হলে তোমার উপায় কী?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে তিনি গোবিন্দ স্মরণ করেছিলেন। আর কথা বলেন নি, উঠে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণেন্দু যেমন উন্মাদের মতো গিয়েছিল তেমনি উন্মাদের মতোই ফিরে চলে এসেছিল। একেবারে স্টেশনে। বাবা তার একবার ফিরেও ডাকেন নি। কলকাতার পথে মাঝপথে নেমে পড়েছিল, সারারাত বসে ছিল প্ল্যাটফর্মের উপর। শেষ রাত্রে আবার ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরেছিল।

এসে রিনার চিঠি পেয়েছিল, 'না—না—না। এ তুমি কোরো না। কৃষ্ণেন্দু আমি মিনতি করছি। এই আমার শেষ কথা কৃষ্ণেন্দু। আমি আসানসোল যাচ্ছি। যাচ্ছি রেভারেণ্ড আরনেস্টের কাছে। তাঁর কাছে শান্তি আছে। শান্তির জন্যে যাচ্ছি আমি। —রিনা।'

কিন্তু কৃষ্ণেন্দু তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে স্থির করেছে।

'রিনাকে তাকে পেতেই হবে। জীবনের যে-কোনো মূল্যে রিনাকে তার চাই। ধর্ম-জাতি-প্রতিষ্ঠা—সব, সব দিতে পারে সে। রিনা জানে না, রেভারেণ্ড আরনেস্ট তাকে শান্তি দিতে পারবেন না। পারেন না। তাঁর ধর্মও পারে না। শান্তি-সুখ আনন্দ-তৃপ্তি—সব আছে তার রিনাকে পাওয়ার মধ্যে। জীবনের সুখ, জীবনের শান্তি যেমন ভোগের মধ্যে বস্তুর মধ্যে নেই—তেমনি জীবনকে ছেড়ে দিয়ে আদর্শবাদের বা ধর্মের আচার আচরণ মন্ত্র জপ ত্যাগ বা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও নেই। শুধু কায়ার মধ্যেও নেই আবার কায়া বাদ দিয়ে মায়ার মধ্যেও নেই। কায়া-মায়া মাখামাখি এই জীবন। জীবনের কাম্য যদি কোথাও থাকে তবে সে জীবনের মধ্যেই আছে। রিনা, তুমি যা চাও তা আমার মধ্যে, আমি যা চাই তা তোমার মধ্যে। রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্বাদ মন মাধুর্য স্নেহ প্রেম সান্ত্বনা, এই তো জীবনের কামনা। এ আছে জীবনের মধ্যেই। আর কোথাও নেই—আর কোথাও নেই।

সে বেরিয়ে পড়েছিল আবার। আর দেরি নয়। একবার গিয়েছিল সে ব্রাউনের কাছে,

পলির কাছে। 'আমি ক্রিশ্চান হওয়া ঠিক করেছি, মিস্টার ব্রাউন।'

ব্রাউন কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর উঠে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, 'আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, গুপ্টা!'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আশা করি রিনার সঙ্গে বিয়েতে কোনো অমত থাকবে না আপনার?'

'নিশ্চয়ই না। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেব। রিনা আঘাতে মর্মাহত হয়ে আসানসোল গেছে। সে থাকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।'

'আজই আমি যাচ্ছি চার্চে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, যদি বল।'

ব্রাউনের সাহায্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মান্তর গ্রহণের পর ব্রাউন বলেছিল, 'ইউ ব্রান আপ টু রিনা। স্প্রিং হার ব্যাক।'

পলি বলেছিল, 'সে কাঁদতে কাঁদতে গেছে। আসুক সে হাসিমুখে।'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'কাল যাব।'

ফিরে গিয়েছিল তার বাসায়। তার আগের দিন সে নতুন বাসা করেছে ধর্মতলায়। রিনাকে নিয়ে সংসার পাতবার মতো বাসা। যেখানে ছিল, ক্রিশ্চান হবার পর আর সেখানে থাকতে চায় নি। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দেবে প্রতিবেশীরা। মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল। ধর্ম যদি ঈশ্বর দেয়, তবে এমন অনুদার কেন? প্রেমহীন করে কেন মানুষকে? এক মুহূর্তে এতকালের প্রীতি স্নেহ সব মুছে গেল? সব মুছে গেল? ঈশ্বর কি প্রেমহীন, প্রীতিহীন, স্নেহহীন? সে কি বিদ্বেষপরায়ণ? সে কি আঘাত করে? মনটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম সে মানে না। ঈশ্বরকে সে নেই বলেই ধ্রুব জানে। তবু হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করে কেমন যেন হয়ে গেল মনটা।

সারাটা রাত বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে রইল। নিউ টেস্টামেন্টখানা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। মন লাগল না। রিনার ছবি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মন তখন আবার উৎসাহে ভরে উঠেছে। সারা রাত রিনার সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছে। সে উঠল। আসানসোল! আসানসোলে যাবে সে। রিনা। সকালের রোদ যেন সোনার ঝলক বলে মনে হচ্ছে।

পৃথিবী মাটির। পৃথিবী কঠিন। সূর্যের আলো সোনা নয়, বড়ো উত্তপ্ত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ তার আত্ম-প্রবঞ্চনায়। নিজেকে নিজে সে যত বঞ্চনা করেছে তার চেয়ে বেশী বঞ্চনা আর কেউ করে নি। অলীককে সত্য বলে ধারণা করে তার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে মুখ থুবড়ে পড়ে হাহাকার করে মরে। সেই অলীকের মোহে সোনাকে বলে মাটি। মুখের খাদ্য ঠেলে দিয়ে উপবাসে নিজেকে পীড়িত করে।

রিনার যে-দৃষ্টি, সেই স্তম্ভিত-বিস্ময়ে-ভরা মুখ আজও তার মনে পড়ে।

সে আসানসোলে মিশনে এসে রিনাকে সামনেই পেয়েছিল। রেভারেণ্ড আয়রনেস্টের বাংলোর সামনে উদাসদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

কৃষ্ণেন্দু উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে ডেকেছিল দূর থেকে, 'রিনা! রিনা!'

রিনা চমকে উঠেছিল। অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'কৃষ্ণেন্দু?'

'হ্যাঁ, রিনা। আমি কাল ব্যাপটাইজ্‌ড হয়েছি। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আর কোন বাধা নেই। তুমি আমার। ইউ আর মাইন।'

রিনার বিচিত্র রূপান্তর ঘটতে লাগল। কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরতে গিয়ে থমকে গেল। রিনা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে, তার মুখের উপরেই নিবদ্ধ, তবু যেন সে তাকে দেখছে না, যৌবনমাধুর্যে অপরূপ তার মুখখানিতে কী লেখা যেন ফুটছে; কপালে, ভ্রূতে, দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ রেখায় স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে আরও দুর্বোধ্য কিছু যেন ফুটে উঠেছে সমস্ত কিছুতে। তার মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা এবং আশ্চর্য আরও কিছু। মহিমা? হ্যাঁ তাই।

ধীরে ধীরে রিনা বলেছিল, 'ক্রিশ্চান হয়েছ? আমার জন্য?'

'হ্যাঁ, রিনা।'

'তোমার ধর্ম, তোমার ঈশ্বর ত্যাগ করেছ? ছি। ছি!'

'রিনা, কী বলছ!'

'তুমি বুঝতে পারছ না? কি ভয়ানক!'

'রিনা! আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি! রিনা!'

'লাইফ ইজ মর্টাল! জীবন নশ্বর। একদিন তা যাবেই। অসংখ্য জীবন অহরহ যাচ্ছে কৃষ্ণেন্দু, ইচ্ছে করে মানুষ মরছে, বিষ খাচ্ছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে। মানুষ মানুষকে মেরে নিজে মরছে। কৃষ্ণেন্দু, সেদিন এখান থেকে কিছু দূরে হাজারিবাগে একজন বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাতে মরেছে! জন ব্রেটনও হয়তো কোনো যুদ্ধে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেবে। বাধ্য হয়ে দেবে। এমন জীবন দেওয়াটা নেশার ধর্ম কৃষ্ণেন্দু। আমার প্রভু জীবন দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের জন্য, ধর্মের জন্য। তুমি আমার জন্যে তোমার সেই ধর্ম, তোমার বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণেন্দু! ফর এ গার্ল? ফর দিস আইজ অব মাইন হুইচ ইউ সো অ্যাডোর—'

কৃষ্ণেন্দু প্রথমটায় বিচলিত হয়ে গিয়েছিল রিনার এই আকস্মিক আক্রমণে। এ-রিনাকে সে এই প্রথম দেখছে। ধর্মান্ধতায় উগ্র উন্মাদ! সে নিজেকে সংবরণ করে এবার বাধা দিয়ে বলেছিল, 'ডোণ্ট বি সিলি, রিনা।'

'সিলি?' প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল রিনা।

দৃঢ়স্বরে কৃষ্ণেন্দুও বলেছিল, 'ইয়েস। সিলি। কারণ কোনো একটা ধর্মকে মানুষ অবলম্বন করে, রিনা, ওই ধর্মকে অতিক্রম করে সর্বজনীন মানব-ধর্মে উপনীত হবার জন্য। এই ধর্মের গোঁড়ামি আর বন্ধনের মধ্যে বন্দীর মতো বাঁধা থাকবার জন্য নয়।'

'ইয়েস। মানি। শুনেছি। কিন্তু বুঝতে পারি না। না পারি, এটুকু বলতে পারি যে, যারা ওখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, তারা একটি মানুষকে পাবার জন্য সে-তপস্যা করে না। তপস্যা করে সব মানুষকে আপন-জন বলে পেতে। একটি নারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না কৃষ্ণেন্দু, সকল জনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, ঢেলে দেয়। ঈশ্বর বড়ো পবিত্র; বড়ো

মূল্যবান। তাঁকে তুমি ত্যাগ করবে কৃষ্ণেন্দু? আমার জন্যে? না। না।'

'কী বলছ তুমি রিনা?'

রিনা আবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'রিনা!'

রিনা বললে, 'না আমার জন্যে নয়। যে সৌন্দর্য তুমি ভালোবাস সেই সৌন্দর্যময় একটি নারীর জন্য।' কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল এবার।

ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণেন্দু তার হাত ধরে বললে, 'রিনা—'

'ছেড়ে দাও। লীভ মী। ডোন্ট টাচ্ মী। প্লীজ—প্লীজ।'

'রিনা!'

নিরুচ্ছ্বাস কান্না কাঁদতে কাঁদতে রিনা বললে, 'তুমি ভয়ংকর, কৃষ্ণেন্দু, তুমি ভয়ংকর। একটি নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার। কৃষ্ণেন্দু, আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তাহলে তাদের কারুকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে আসবে, সেদিন আমাকেও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মতো। তোমার যে ঈশ্বরকে তোমার একান্ত আপনার বলে এতদিন জেনে এসেছ, ভালোবেসেছ—বিপদে ডেকেছ,—অভয় পেয়েছ—। ওঃ! তুমি যাও! আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু না। বিবাহ করতে আমি পারব না। তুমি ভয়ংকর!'

কৃষ্ণেন্দু স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। প্রতিটি কথা তাকে যেন বিদ্ধ করছিল সূচের মত। একটু থেমে রিনা আবার বললে,—'তোমার বাবা যদি আমায় বলেন—তোমার জন্যে আমাকে আমার ধর্মের সঙ্গে আমার ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে হবে—তবে আমি তা পারি? না—না—না। তুমি যাও—তুমি যাও।' বলেই সে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। একটা আতঙ্ক যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

পাথর হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। স্থির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে, হয়ে গেছে অর্থহীন। তার কেউ নেই। কিছুই তার নেই। কি করবে সে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ পাদরি। তিনি বোধ হয় দুজনের কথার মধ্যে আসতে চান নি। তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

'ইয়ং ম্যান!'

'গুড মর্নিং, ফাদার।' সে সচেতন হয়ে উঠল এতক্ষণে।

'গুড মর্নিং। বসবে? বিশ্রাম করবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার। অনেক ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। আমি নেক্সট্ ট্রেন ধরতে চাই।'

ফাদার বলিলেন, 'কোথায় যাবে তুমি? তোমার মনের অবস্থা আমি জানি।'

সে বলেছিল, 'জানেন না ফাদার। আমিও জানি না। আমি ভেবে দেখব। লেট মি থিঙ্ক ফাদার।'

'—My Son——'

কৃষ্ণেন্দু বলেছিল, 'আমি কথা দিচ্ছি ফাদার—আমি মরব না।'

সে চলে এসেছিল।

* * *

সেই রিনা ব্রাউন। যে এর পর বুকে ঝুলিয়ে নেবে ক্রশ আর যার একমাত্র পাঠ্য হবে হোলি বাইবেল, ভেবেছিল কৃষ্ণেন্দু। যে রিনা ব্রাউন সারা জীবন অবিবাহিত থাকবে ভেবেছিল, সেই রিনা ব্রাউন! সে উন্মাদিনীর মতো মদ আর ব্যভিচারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। আমেরিকান অফিসারের জীবনের সাধ-মিটিয়ে-নেওয়া উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হেসে বেড়াচ্ছে। স্মৃতিও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

ওথেলোর কথাও তার মন থেকে মুছে গেছে। বললেও মনে পড়ে না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে সহ্য করতে না-পারায় ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তিক্ত দৃষ্টির মধ্যে।

আর কৃষ্ণেন্দু? সে কৃষ্ণস্বামী হয়ে এই অরণ্য অঞ্চলে রোগীর চিকিৎসা এবং কুষ্ঠরোগীর সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে; রিনা বলেছিল, 'বিশেষ ধর্মকে অতিক্রম করে মানুষ নির্বিশেষে মানবধর্মে পৌঁছেছে। মানুষ একজনের জন্য নয়, একটি নারীকে বা একটি পুরুষকে পাবার জন্য নয়, সকল মানুষকে আপনার বলে পাবার জন্য।'*

শুধু রেভারেণ্ড কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত সে নয়। সে ক্রিশ্চান, সে ভারতীয় সন্ন্যাসী: রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী। যে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার জন্য রিনা তাকে জয় করেছিল, সে ঈশ্বরকে তাকে পেতে হবে; তাকে খুঁজেছে। তার সন্ধান সে পেয়েছে।

মানুষের বস্তুময় দেহের মধ্যে তাঁকে সে ওতঃপ্রোত দেখেছে।

চিদ্‌ব্রহ্মান্তিকর মহাসত্তা! বিরাট মহাসত্তায় উপনীত হবে মানুষ। শুভ্র পবিত্র মমতায় কোমল, সত্যে নির্মল, প্রেমে পরিশুদ্ধ অহিংস। এই যুদ্ধের মধ্যেও সে তপস্যাকে ডুবিয়ে নিঃশেষ করতে পারে নি। তামসীর মতো সে তাকে গ্রাস করতে গিয়েও পারছে না।

বিচিত্র বিস্ময় এই যে, তাকে সেই ঈশ্বরসন্ধানী দেখেই সেই রিনা আজ ভয় পেল; সঙ্কুচিত হয়ে গেল, হিংস্র হয়ে উঠল মানুষ দেখে সরীসৃপের মতো।

আশ্চর্য, সেই নির্মল আলোকসন্ধানী রিনা, আজ এই যুদ্ধের মধ্যে যে উন্মাদিনী তামসী নিজেকে প্রকট করেছে, সে গ্রাস করতে চায় সমস্ত তপস্যাকে, হত্যা করতে চায় ঈশ্বরকে, সেই তামসীর সে ক্রীতদাসী, ক্রীড়াসঙ্গিনী, প্রেতিনী। হয়তো বা তারই প্রতীক। হে ভগবান! ওহ্ গড!

রিনা—হঠাৎ জীপের গর্জনে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! জীপ! তিনি ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। জীপের সঙ্গে রিনার অস্তিত্ব যেন মনের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে মেঘগর্জনের মতো। তিনি উঠে পড়লেন। হঠাৎ নজরে পড়ল জোড়-বাংলা মন্দিরের মাথায় মিলিটারী-পোশাক-পরা কারা ঘুরছে, দেখছে বাইনোকুলার দিয়ে। প্রমোদভ্রমণ আর উল্লাস, উচ্ছৃঙ্খলতা আর উন্মত্ততা। তামসী রিনা সঙ্গে আছে। নিশ্চয়। ভয়ার্তের মতো কৃষ্ণস্বামী উঠলেন। পাকা রাস্তায় নয়। মাঠে মাঠে এসে বনের পথ ধরে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

রিনা তার ঈশ্বর তাকে দিয়ে নিজের জীবনে নিঃস্ব হয়ে গেল কি—তার অবিশ্বাস— তার রিক্ততার তিক্ততায় হাহাকারে—ভয়ঙ্করতায় ?

ছয়

বনের ভিতর দিয়ে চলেছিলেন কৃষ্ণস্বামী। দ্রুতপদেই চলেছিলেন। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। রোগীরা এসে বসে আছে। অসুস্থ মানুষ। তাঁর ভগবান। ব্লেসেড্ আর দি পুওর ইন স্পিরিট : ফর দেয়ার্স ইজ দি কিংডম্ অফ হেভেন্। তারাই ভক্ত। 'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ'—ভক্তের হৃদয়ে আমি বাস করি। ওরা অশিক্ষার মধ্যেও ভগবানকে ভক্তি করে। অন্ধকারের মধ্যে বাস করেও ওরা আলো চায়। ওরা জীবনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে না। আলোর অভাবেই আলো বলে কাঁদে। ওদের মধ্যে ঈশ্বরের তপস্যা আছে।

বনে কোনো ফুল ফুটেছে। গন্ধ উঠেছে। পাখিরা কলকল করছে। সূর্য আজ মেঘের আড়ালে ঢাকা। বনভূমি বর্ষণের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। প্রতিটি পাতার মধ্যে কৃষ্ণস্বামী অনুভব করছেন উদ্ভিদ-প্রাণের ব্যাকুল প্রত্যাশা।

'হ্যালো, ডু ঈ হিয়ার ? হ্যালো ?

চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। নারী-কণ্ঠস্বর, রিনা ব্রাউনের গলা। এই বনের মধ্যে ? এই সকালে ? এদিক ওদিক তাকিয়ে কৃষ্ণস্বামী দেখলেন রিনা ব্রাউন বনের ভিতরে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় একটা একক বড়ো শালের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পাশে একটা ফ্লাস্ক ; হাতে সিগারেট। সেই পোশাক।

কৃষ্ণস্বামী শুধু বললেন, 'ইয়েস্ ?'

'কাম হিয়ার, সিট ডাউন। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক, এ স্মোক ?'

'আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক, ডোন্ট স্মোক। থ্যাঙ্ক ইউ।'

এবার চিৎকার করে উঠল রিনা, 'কৃষ্ণেন্দু!'

হেসে কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'আমার রোগী বসে আছে রিনা—আমি যাই। আমাকে ক্ষমা করো।' তারপর আবার বললেন, 'তুমি চিনেছ রিনা। কাল ভেবেছিলাম তোমার স্মৃতিও ভ্রংশ হয়ে গেছে।'

'গেছে। অনেক গেছে। কিন্তু ওথেলো ভুলি নি। 'লেট মী লুক অ্যাট ইয়োর আইজ, লুক ইন মাই ফেস্' বলে আমার দিকে যখনই তাকালে, তোমার দৃষ্টি আমি তখনই চিনলাম। কিন্তু—।'

সিগারেট টানতে লাগল রিনা। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ওর হাতের আঙুল কাঁপছে।

'আমি যাই রিনা।'

'তুমি এখানে কী করছ? এ কী পোশাক? এ কী চেহারা?'

'আমি ক্রিশ্চান হয়েছিলাম তুমি জান। তারপর হয়েছি সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষের ক্রিশ্চান সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসীতে যা করে তাই করছি। ঈশ্বরকে খুঁজছি। অবশ্য মানুষের সেবার মধ্যে। আমি ডাক্তার, ওদের চিকিৎসা করি। কিন্তু মূল চিকিৎসা,—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা।'

রিনার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিনা বললে, 'জীবনটাকে নষ্ট করলে কৃষ্ণেন্দু! আই অ্যাম্ দি কজ্, আই অ্যাম্ দি কজ্—'

'না। জীবন আমার নষ্ট হয় নি। তুমি আমাকে যা বলেছিলে, তা মিথ্যা বল নি। পৃথিবীতে ঈশ্বরের চেয়ে বড় কিছু নেই।'

'আমি বলেছিলাম তোমাকে? হ্যাঁ আমি বলেছিলাম। আই অ্যাম্ দি কজ।'

'আমি যাই। গুড বাই।'

'দাঁড়াও। আমি আবার বলছি—আমি ভুল বলেছিলাম। এ পথ তুমি ছাড়।'

'না। আমি যাই। গুড বাই!'

'আর এক মিনিট। আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে না?'

'না। তোমার কথা তোমার রূপের মধ্যেই প্রকাশ, রিনা। কী জিজ্ঞাসা করব?'

'আবার বলছি ঈশ্বর নেই কৃষ্ণেন্দু। আমি তোমাকে ভুল বলেছিলাম। দুঃখ দিয়েছিলাম। ঈশ্বর নেই।'

উঠে দাঁড়াল রিনা ব্রাউন। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—'শোন আমার কথা। আমি বলছি ঈশ্বর নেই। নাথিং ইজ সিন—পাপ নেই, পুণ্য নেই, ঈশ্বর নেই।'

কণ্ঠস্বর তার তীব্রতর হয়ে উঠল। এগিয়ে এসে কৃষ্ণস্বামীর পথরোধ করে দাঁড়াল।

'তুমি এ-সব ছাড়ো কৃষ্ণেন্দু। জীবনকে নষ্ট কোরো না। ফিরে যাও। নতুন জীবন আরম্ভ করো।'

'তোমার সঙ্গে?'

হি-হি করে হেসে উঠল রিনা ব্রাউন। তীব্র তীক্ষ্ণ বীভৎস হাসি। হাসি থামিয়ে বললে, 'আমার এখন দাম অনেক কৃষ্ণেন্দু। তোমার দাম আমার কাছে সেদিনের চেয়ে কম! সেদিন ভয় করে বলেছিলাম। আজ করুণা হচ্ছে। হার্টলেস, ভোসাইল, ওয়ার্থলেস, ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ন্যাসী তুমি, নির্বোধ তুমি, মূর্খ তুমি, আমার ঘৃণার পাত্রও নও, করুণার পাত্র।'

কৃষ্ণস্বামী আর কথা বললেন না, এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে রূঢ় চিৎকার করে উঠল রিনা ব্রাউন, 'শোনো, আমার কথা শোনো। ইউ মাস্ট লীভ দিস প্লেস। এখানে থাকতে তুমি পাবে না। চলে যাও। অনেক দূরে!'

কৃষ্ণস্বামী ঘুরে দাঁড়ালেন।

রিনার এমন তীব্র মূর্তি তিনি কখনও দেখেন নি। তার দীর্ঘ ঘন কালো নেত্ররোমের স্বপ্নালু বেষ্টনীর মধ্যে আরও কালো চোখ যে এমন জ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারে, তা তাঁর

কল্পনাতীত। চোখ দুটো তার জ্বলছে। ধক-ধক করছে।

রিনা বললে, 'তোমার এই বাংলোটা আমার চাই। আমি এখানে থাকব। অনেক দিন থাকব। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইউ মাস্ট। না হলে আমি ওদের লেলিয়ে দেব। ওরা তোমাকে, ওরা কেন, আমিই তোমাকে গুলি করে মারব।'

রুক্মস্বামী কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে আবার চলতে শুরু করলেন। আর পিছন ফিরলেন না। ভীত তিনি হলেন। নিজের জন্য নয়। ওই সুনকির জন্য। সিন্ধুর জন্যও বটে।

রিনা ব্রাউন প্রেতিনীর মতো গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছে। হয়তো ফ্লাস্ক খুলে মদ খাচ্ছে। অনুমান করতে এতটুকু বিলম্ব হল না তাঁর

* * *

ঠিক করলেন, সুনকি আর সিন্ধু গ্রামের ভিতরে গিয়ে থাকবে। লাল সিং ওদের আগলাবে। সেও যাবে। তিনি থাকবেন একা।

তাঁর ভয় নেই। ভয় রুক্মেন্দুর কোনো কালে ছিল না। রুক্মস্বামী হয়ে তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন কেন? আসুক মৃত্যু। সম্মুখে প্রতিরোধ করে তিনি মরবেন। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের ভয়ে তিনি পালাবেন?

রাত্রি তখন নটা। তিনি বসে ছিলেন। প্রতিটি জীপের বা মোটরের শব্দে একটু সজাগ হয়ে উঠছিলেন। মধ্যে মধ্যে এক-একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন। আকাশ বর্ষার মেঘে ভরেছে। আজ, হয়তো আজই বর্ষা নামবে। দিগন্তে মৃদু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তিনি ও-কথা ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন নিষ্কলুষ পবিত্রতার প্রতিমূর্তি রিনার কথা। প্রেতিনী রিনা ব্রাউনের কথা। প্রেতিনী নয়, সাক্ষাৎ তামসী আজ রিনা ব্রাউন।

রাত্রি তামসা নয়। রাত্রির অন্ধকারে জীবনের মধ্য থেকেই তামসী বেরিয়ে আসে। বস্তু-জগতে, স্নায়ু-জগতে ক্ষোভের কারণ না থাকলে, অনিয়ম না ঘটলে সে জাগে না। ক্ষোভ মিটলেই সে শান্ত হয়, স্থিত হয়। জীবনের মধ্যেই সে সদাজাগ্রত, চেতনার মধ্যে অহরহ সে সক্রিয়। সুপ্তির মধ্যে সে দুঃস্বপ্ন, অবসর-বিশ্রামের মধ্যে সে কুটিল কল্পনা। শান্তির পথে, সুখের পথে, চৈতন্যের পথে মানুষকে এগুতে সে দেবে না। নিষ্ঠুর আক্রোশে পিছন থেকে অজগরের মতো আক্রমণ করছে। গ্রাস করতে চাইছে। একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে গ্রাস না করে ক্ষান্ত হবে না।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তন্দ্রা এসেছিল রুক্মস্বামীর। টর্চের আলোয় তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি উঠে বসলেন:

'কে?'

দূর-দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই ক্ষণিক আলোতেই দেখলেন, হ্যাঁ, সে-ই বটে। দীর্ঘাঙ্গী নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে। একটু একটু টলছে। রিনা ব্রাউন উত্তর দিল, 'আমি।

তুমি আমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছ দেখছি।'

'আমি। শুধু তোমার নয়, তোমার সঙ্গে আরও লোকের প্রতীক্ষা করছিলাম। যারা ভয়ঙ্করী-লোলুপ ভয়ঙ্কর। যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বাড়িতে যত প্রয়োজন তোমার—আমাকে তাড়ানো তার চেয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন। তুমি স্বস্তি পাচ্ছ না। কিন্তু কেন?'

একখানা চেয়ারে বসে রিনা বললে, 'ইউ মাস্ট গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। তোমাকে যেতে হবে।'

'নো। আই মাস্ট নট গো। ঈশ্বরের সাধনায় আমি এখানে শপথ নিয়ে এসেছি। এ আমার সাধনার আসন।'

'স্টপ।' চিৎকার করে উঠল রিনা। আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'সব মিথ্যে। ঈশ্বর নেই। কোনোদিন ছিল কি না জানি না। থাকলে সে মৃত। মানুষ তাকে মেরে ফেলেছে। আমার দিকে দেখো। আমি তার সমাধি। আমার বাবা সভ্য ইংরেজ, ধর্মবিশ্বাসী ক্রীশ্চান—তাকে মেরে আমার মধ্যে সমাধি দিয়েছে। আমি তোমাকে বলছি। যা মৃত তা বাঁচে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসের গলিত শবটা ছেড়ে দাও। চলে যাও এখান থেকে।'

'তুমি আজ যা-ই হয়ে থাক রিনা, তুমি ক্রীশ্চান।'

'না, না, না। আমি ক্রীশ্চান নই। এতক্ষণ শুনলে কি?'

'রিনা!'

'কোনোদিন ছিলাম না। আমার ক্রস, আমার বাইবেল আমি ফেলে দিয়েছি। কোনোদিন আমি ব্যাপটাইজ্‌ড হই নি। দীক্ষা আমার বাবা নিতে দেয় নি। কোনো ধর্মই আমার নেই। বাবা জেমস ব্রাউন ইংরেজ, ধর্মে ক্রীশ্চান, অত্যাচারী জমিদার। আমার মা হিদেন, হিন্দুদের মধ্যেও বন্য অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে। লালসা চরিতার্থ করবার জন্য বাবা তাকে উপপত্নী হিসেবে রেখেছিল, তাকে কিনেছিল। আমি তাদের জারজ সন্তান। কৃষ্ণেন্দু, সেই আয়া, সেই কুন্তী আমার মা।'

বিদ্যুৎচমকের মেঘগর্জনটা ঠিক এই মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়ে উঠল রিনার কথার প্রতিধ্বনির মতো। কৃষ্ণেন্দু বজ্রাহতের মতোই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোনো কথা, একটা বিস্ময়সূচক মর্মান্তিক ধ্বনিও বের হল না। রিনা হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে কাঁধে-ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা মদ খেয়ে নিয়ে বললে, 'আরও শুনবে? আরও অনেক আছে। আমার ওই মা কুন্তী, সে হল, মেদিনীপুরে যেখানে ব্রাউনের জমিদারি ছিল, সেখানকার জঙ্গল-মহলের পুরনো এক ছত্রী ইজারাদারের রক্ষিতা এমনি এক বুনো মেয়ের গর্ভজাত মেয়ে। ইজারাদারের রক্ষিতা ছিল এক ব্রাহ্মণের ব্যাভিচারের ফল। আরও শুনবে? কালো মেয়েদের রক্তের সঙ্গে অনেক-ফরসা রঙের মিলে হয়েছিল শেষ সাদা ইংরেজের রঙ। সবটা প্রকাশ পেল আমার মধ্যে। কালো চুল, বড়ো বড়ো চোখের পাতা, সাদা রঙ। রঙরূপ আমার যাই হোক, আমার কি কোনো ধর্ম আছে, আমার কি কোনো ঈশ্বর আছে? ঈশ্বরের ধর্মের আমি

জীবন্ত সমাধি। মৃত ঈশ্বর আমার মধ্যে পচছে। গন্ধ উঠছে।'

রিনা স্তব্ধ হয়ে গেল অকস্মাৎ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

কৃষ্ণস্বামীর মনে হল চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে এসেছে। তিনি বললেন, 'তুমি কাঁদছ।'

'কাঁদছি? লুক'—সে টর্চটা জেলে নিজের মুখের উপর ধরলে। না, রিনা কাঁদে নি। চোখ দুটি তার নেশায় আরক্ত, দৃষ্টি তার অসহনীয় তীব্র।

'চোখের জল আমার অনেক দিন শুকিয়ে গেছে। মরুভূমি হয়ে গেছে। অনেক কেঁদে জল শেষ হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীরে রিনা বললে, 'সব তোমার জন্যে কৃষ্ণেন্দু, ইউ আর দি কজ্, ইউ আর দি কজ্, আজ তোমার নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করেই বলছি, ইউ আর দি কজ্।' একটু হাসলে রিনা। বোধ করি ওথেলোর এই দৃশ্যটির অভিনয়ের সুখস্মৃতি খানিকটা মাধুর্যের সঞ্চার করলে ক্ষণিকের জন্য।

'তোমার মতো ভালোবাসার জনকে ফিরিয়ে দিলাম, তুমি ঈশ্বরকে, ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর না বলে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি ভাবছি, আমার নিজেকে না দিয়ে সেদিন আমার ঈশ্বর, আমার ধর্ম সব বোধ হয় তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি সব কেড়ে নিয়ে এসেছিলে আমার অজ্ঞাতসারে।'

আবার একটু স্তব্ধ থেকে বললে, 'আসানসোল থেকে ফিরে এলাম। ঈশ্বর এবং ধর্মকে আমি এত ভালোবাসতাম কৃষ্ণেন্দু যে অন্তর হাহাকার করলেও আমি কাঁদি নি। সংকল্প করেছিলাম সারাজীবন 'নান' হয়ে কাটিয়ে দেব। ব্রাউন সাহেব—তাকে বাবা বলতে আমার ঘৃণা হয় কৃষ্ণেন্দু—সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলে; সে কই? আমি তাকে বললাম, 'আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।' সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? সে ক্রীশ্চান হয়েছে, তুমি জান না? সে তোমাকে বলে নি?' বললাম, 'বলেছে'। জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে?' আমি তোমাকে যা বলেছিলাম, সব বললাম। কৃষ্ণেন্দু, এক মুহূর্তে তার মুখোশ খুলে গেল। চিৎকার করে উঠল, 'ব্যাস্টার্ড—বিচ।' তারপর অনর্গল কুৎসিত, অশ্লীল গালাগাল। বললে, 'ক্রীশ্চান? তুই ক্রীশ্চান? ডু ইউ নো, হিদেন এই কুন্তী, হিদেনদের চেয়েও ঘৃণিত ও। ওরা পর পর তিন জেনারেশন ব্যাস্টার্ড, এই তোর মা।' বললে, 'জীবনে মুহূর্তের দুর্বলতা আমাকে এত বড় ভুল করালে। তোর সাদা রঙ দেখে আমি ভুলে গেলাম। তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

একটা সিগারেট ধরালে রিনা। তারপর আবার কথা বলতে গিয়েই থমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইট্স্ রেনিং। বৃষ্টি এল।' হেসে বললে, 'কুন্তী-মা আমার বলত, জল আইচে গ।'

কয়েকটা বড়ো বড়ো ফোঁটা কৃষ্ণস্বামীর কপালে হাতে এসে পড়ল। দূরান্তরে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে। আসছে ধারা বর্ষণ। মৃদুমন্দ নৈঋতী হাওয়া বইছে।

কৃষ্ণস্বামী বললো, 'ভিতরে চলো রিনা।'

'ঘরের ভিতরে? চলো। কিন্তু তাতেই বা কী দরকার। আমি চলে যাই। শুধু বলে যাই, তোমাকে বলেছি, আবার বলছি, এখান থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে। আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। ইউ মাস্ট।'

'সে হবে রিনা। কিন্তু এই বৃষ্টিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যাবে?'

'ভিজতে ভিজতে চলে যাব। দুর্যোগ আমি ভালোবাসি কৃষ্ণেন্দু। আগে ঝড়-জল এলে ভয় করতাম। এখন আনন্দ পাই। আই ফিয়ার নো ডার্কনেস, আই ফিয়ার নো স্টর্ম, আই ফিয়ার নো থাণ্ডার, লেট মী গো। বাট ইউ মাস্ট লীভ দি প্লেস।'

'না। বোসো।'

ঘরের মধ্যে এসে স্তিমিত লণ্ঠনটি উজ্জ্বল করে দিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'নো।' বলে রিনা এসে আলোটিকে কমিয়ে, নিভিয়ে দিল। পলতেটা পড়ে গেল। 'অন্ধকার—অন্ধকার ভালো। জান, ব্রাউনের কাছে সব কথা শুনে তিনদিন আমি অন্ধকারে পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আলো জ্বালি নি। নিজের দিকে চেয়ে দেখতে ভয় হত আমার। আমার সঙ্গে সমানে কাঁদত আমার মা। কুন্তী। ব্রাউনকে আমি ঘৃণা করি। কুন্তীকে ঘৃণা করতে পারি নি। হতভাগিনী। ব্রাউনের ভয়ে ভয়ার্ত মূক জন্তুর মতো সারাজীবন আমার আয়া হয়ে থেকেছে, কোনোদিন আমাকে মেয়ে বলে একবিন্দু স্নেহ মমতা আমার কাছে চাইতে পারে নি। অন্ধকারে দুজনে কাঁদতাম। নিজের কলঙ্কের ভয়ে—আমার মাতৃপরিচয়ের অমর্যাদা পাছে তাকে স্পর্শ করে, আমাকে স্পর্শ করে, তার লজ্জায়—সে আমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিতও করে নি। আমাকে নার্সারিতে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মায়ের তখনও রূপ-যৌবন ছিল। সে-রূপে নাকি এক বন্য মোহ ছিল। সে মোহ আশ্চর্য। আমার চুলে চোখে চোখের পাতায় তার পরিচয় আছে। তাকেও সে তাড়ায় নি। তাকে সে কিনেছিল। ভোগ করত, বর্বরের মতো। ক্রীস্টান! ক্রাইস্ট—সন অব গড! তিনি ছিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। রোমান ইম্পিরিয়লিস্টরা মেরেছিল তাঁকে। লোকের বিশ্বাস, তিনি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। হয়ে থাকলেও ইম্পিরিয়লিস্টরা যে এখনও মরে নি। তারা যে তাঁকে ক্রুশে নিত্য বিঁধে মারছে। প্রতিদিন তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হচ্ছেন!'

হাসলে রিনা। হেসে বললে, 'এরা কিন্তু একটা জায়গায় মহৎ। ক্লেটন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই খাঁটি ইংরেজ জমিদার তার আভিজাত্য বজায় রেখে আমার সব বৃত্তান্ত তাকে জানিয়েছিল। ক্লেটনের বাবা ধন্যবাদ জানিয়েছিল ব্রাউনকে। তুমি হিদেন বলে তোমাকে সত্য বলার প্রয়োজন মনে করে নি। আমি ক্রীশ্চান নই, তবু তোমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত না করে আমার সঙ্গে বিয়েতে মত দেয় নি।' আমি হিদেনের গর্ভজাত মেয়ে, আমাকে বাইবেল আর ক্রুশ দিয়েছিল খেলার ছলে। তার কোনো মূল্য নেই। ঈশ্বর ধর্ম কোনো কিছুর উপর আমার কোনো অধিকার নেই। ঈশ্বর মূক, কোনো ভাষা নেই তাঁর, তিনি প্রতিবাদ করেন নি, ধর্মের ঘরের তালা রীতির কোডে মেলে নি বলে খোলে নি। আমি সামনে পেয়েছি নরকের সিংহদ্বার খোলা—তার মধ্যে ঢুকেছি।' সে

সিগারেট ধরাল।

বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষণ নেমেছে। চারিপাশের সুদীর্ঘ বিশাল শালবনের পল্লবে ধারাপতনের শব্দে শব্দময় মেঘমল্লার বেজে বেজে উঠছে। বিচিত্র ঝর-ঝর এক সঙ্গীত। পৃথিবীর অন্য সব শব্দ ডুবে গিয়েছে। এমন কি, জীপ কি মোটরের শব্দও ভালো শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রিনা উঠে দাঁড়াল। একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললে, 'কী সুন্দর রাত্রি! মনে হচ্ছে, বিশ্বজগতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।'

কৃষ্ণস্বামী স্তব্ধ হয়ে রিনার কাহিনী শুনে সেই স্তব্ধ হয়েই বসে ছিলেন। বেদনায় করুণায় তাঁর অন্তর মুহ্যমান হয়ে গেছে। বাইরের ওই সজল বাতাসের প্রবাহের মতো হায়-হায় করে সারা হয়ে গেল। এমনি করেই কাঁদছে। হে ভগবান, তুমি ওর অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হও। ওর অন্তরের কবরখানা বিদীর্ণ করে জেগে ওঠো। তোমার স্পর্শে কুষ্ঠরোগীর নিরাময় হওয়ার মতোই কঠিন আঘাতে বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরকে সুস্থ সুন্দর করে তোলো। সুন্দর রিনা, এখনও সুন্দর। এখনও সেই মাধুরী তার সর্বাঙ্গে, এখনও তার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মঘেরা আয়ত কালো চোখ দুটি মানস-সরোবরের মতো স্বচ্ছ গভীর। আকাশের প্রতিবিম্বে এখনও সে নীলাভা প্রতিফলনের শক্তি হারায় নি। মেঘ তুমি কাটিয়ে দাও, অপসারিত করো। হে ঈশ্বর! নরকের মুখে উন্মাদ যাত্রীকে তুমি ডাকো, 'ফিরে আয়'—বলে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'রিনা, ঈশ্বরের সমাধি বার বার রচনা করবার চেষ্টা করেছে ঈশ্বরের বিপরীত শক্তি। আলো আর কালো। ভালো আর মন্দ। কিন্তু বার বার মন্দ হেরেছে, ভালো জিতেছে। ঈশ্বর সে-সমাধি বিদীর্ণ করে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন। হায় রিনা, অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, অনেক বেদনা। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তখন দূরে চলে গেছি। আমি জানলে এ দুঃখ তোমাকে পেতে দিতাম না। বলতাম—জীবন, সে ঈশ্বরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে মানুষের জীবনেই ভগবান কথা কন, হাসেন, কাঁদেন, ভালোবাসেন, নিজেকে নিজে বলি দেন, বিশ্বের কাছে বিলিয়ে দেন, মানুষের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ! মানুষের মধ্যে জীবন, সে যেখান থেকেই উদ্ভূত হোক, সে সমান পবিত্র। ব্রাহ্মণ নেই, চণ্ডাল নেই, ক্রীশ্চান নেই, হিদেন নেই, ধনী নেই, দরিদ্র নেই। গোত্র কুল ইতিহাস পরিচয় থাক না-থাক, মানুষ সমান পবিত্র, তার মধ্যে ঈশ্বর সমান মহিমায় আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল। তোমাকে নিয়ে আমি মহা আনন্দে এই তপস্যা করতাম।'

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে-ঈশ্বরকে তুমি সমাধিস্থ করেছ বলছ, তিনি আবার উঠবেন।' তুমি শান্ত হও।'

'ডোন্ট টাচ মী প্রীজ। ডোন্ট। ডোন্ট, কৃষ্ণেন্দু! আমাকে স্পর্শ করো না।' চিৎকার করে উঠল রিনা। সে যেন আর্তনাদ।

'পীস্ অ্যাণ্ড বী স্টিল্, রিনা।' ওথেলো মনে পড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরে স্বপ্নাবেশের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের চেষ্টা করলেন কৃষ্ণস্বামী।

কিন্তু রিনা অধীর কণ্ঠে বললে, 'শান্তি আমার নেই। স্থির আমি হতে পারব না, কৃষ্ণেন্দু। তুমি জানো না। ও-সবের কোনো কিছুতেই আমার আর অধিকার নেই। আমার ব্যভিচারী জন্মদাতা ব্রাউন আমাকে বলেছিল—আমার ধর্মে অধিকার নেই—ঈশ্বরে অধিকার নেই—পবিত্রতায় অধিকার নেই। যেমন করে ওরা সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে জবরদস্তি বলছে—তোমাদের কোন অধিকার নেই—আর তাদের থাকছে না—হারাচ্ছে। তারাও বিশ্বাস করছে। আমার তাই হয়েছিল—আমার অধিকার নেই বলে নিজেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম নরককুণ্ডে। সেখানে পাঁকের মধ্যে ফুলের মতো আমি পচতে লাগলাম—আজ আমার ভিতরটা নিঃশেষে পচে গেছে। শয়তান আমাকে অধিকার করেছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পবিত্রতার কথা আর ভাবতেই আমি পারি না। দুর্দান্ত ক্রোধে অন্তর আমার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগে ওঠে শরীরে। আমি কাঁদতে পারি না। আমি ব্রাউনের উপর রাগে আক্রোশে বেরিয়ে এসেছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম বাইবেল; পাছে তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম জঘন্য পল্লীতে। সঙ্গে আমার মা। সে এই রাত্রির মতো। অন্ধকার মূক। পাপ কর, পুণ্য কর, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ নেই, শাসন নেই, বরং নীরব প্রশ্রয় আছে; কালো সর্বাঙ্গে কাপড়ের কালো ঘের দিয়ে ঢেকে রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। জীবন আরম্ভ করলাম রিপন স্ট্রীট অঞ্চলে। নাইট ডেনের জীবন। সিটনের কোচম্যান, ডেনের বয়েরা যার পরিচালক। সেখান থেকে হোটেলে গিয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে এই যুদ্ধের মধ্যে দেহ বিক্রি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শয়তান বেঁধে রেখেছে আমাকে। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'রিনা!' শিউরে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী।

'না। দোষ কাউকে দেব না। সব আমার জন্মফল। আমার জন্ম থেকেই পঙ্ককুণ্ড কৃষ্ণেন্দু, সেখানে তুমি পাঁকে কবরে চাপা পড়েছ, ঈশ্বর পড়েছে, ঈশ্বরের পুত্র পড়েছে, ব্রাউন সাহেব দিয়েছে চাপা।'

'রিনা!' হাতখানি টেনে নিলেন কৃষ্ণস্বামী।

'আমাকে চাও তুমি? প্রেম নেই। দেহ দিতে পারি আমি। প্রাণ নেই। মন নেই। মনও গেছে। প্রেমও নেই। চাও তুমি প্রাণহীন, মনহীন শুধু কোমল মাংসপিণ্ডের এই দেহ?'

হাত ছেড়ে দিলেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন—'

'নো! নো! নো! ও নাম কোরো না।'

'মৃতকে তোমার ভয় কি?'

'ভয় নয়, ঘৃণা। শোনো কৃষ্ণেন্দু, তুমি এখানে থাকতে আমি স্বস্তি পাব না। তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে। তুমি যাও। কৃষ্ণেন্দু! না হলে হয়তো আমি তোমাকে গুলি করে মারব। কিংবা ওরা মারবে। ওরা যদি জানতে পারে—তোমার জন্যে আমি চলে যাব, তা হলে ওরা ক্ষমা করবে না।'

কৃষ্ণস্বামী অন্ধকারের মধ্যেই যেখানে দেওয়ালের ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি মূর্তি টাঙানো ছিল

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন : হে অবিনশ্বর ! নিজেকে প্রকাশ করো তুমি।

'কৃষ্ণেন্দু, তুমি যাবে কি না বলো।'

'না।'

'না ?'

'না।'

'অন্যত্র গিয়ে তুমি তোমার কাজ করো। আমাকে উদ্ধার কোরো না তুমি।'

'না।'

'কেন ? কিসের জন্য ? আমার জন্য ? আমার দেহ চাও ?'

অত্যন্ত স্থির সঞ্চালনে ঘাড় নাড়লেন কৃষ্ণস্বামী। বললেন, 'না। তোমার দেহ নিয়ে কী করব ? আমি চাই তোমার আত্মাকে। তোমার মনকে। দেহ মরে যায় পচে যায়। আত্মা অমর। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিলেন, 'কী হবে ওতে ? আমি তোমার আসল তোমাকে চাই। তোমার চিরন্তন তোমাকে। ইহকালের পরকালের তোমাকে।'

'সে নেই। পাবে না। তবে কেন ? কিসের জন্য থাকতে চাও এখানে ? কিসের জন্য ? মরবে ?' চিৎকার করে উঠল রিনা।

'মরব।' শান্ত কণ্ঠে কৃষ্ণস্বামী বললেন,—'দ্যাট উইল বি মাই ক্রুশিফিকেশন। আই এ্যাম হিয়ার টু বি ক্রুশিফায়েড এগেন।'

বলতে বলতেই রিনার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে তিনি জ্বাললেন। ছটাটা গিয়ে পড়ল ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির উপর।

পর-মুহূর্তেই রিনা ক্ষিপ্রবেগে কী টেনে বের করলে। পিস্তল। পিস্তলটা তুলে গুলি করলে। মূর্তিটা ভেঙে পড়ে গেল। কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন—'রিনা।'

রিনা বেরিয়ে চলে গেল কক্ষচ্যুত উল্কার মতো। এতক্ষণে সচেতন হলেন কৃষ্ণস্বামী। দ্রুত বেরিয়ে এলেন—ডাকলেন—'রিনা। রিনা। রিনা।'

'নো। নো। নো।' উত্তর ভেসে এল দূর থেকে—'নো।'

* * *

সেই অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রিতে তিনি পথের ধারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা হল—রিনা নিশ্চয় ফিরবে। কিন্তু রিনা ফিরল না।

পরদিন তিনি গেলেন পিয়ারা-ডোবা : রিনা ব্রাউন কোথায় ? কোন খোঁজ মিলল না। বনের ভিতরটা তিনি খুঁজলেন। রিনার মৃতদেহ মিলল না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন—মরেছে সে ? উত্তর পেলেন—না সে মরেনি। নিজে সে মরবে না। না।

সেই থেকে আর রিনাকে দেখা গেল না।

আরও কতদিন কৃষ্ণস্বামী গেলেন পিয়ারা-ডোবা ; কতদিন মোরারে রাস্তায় তেমাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কতদিন রামচরণের কটকে অপ্রয়োজনে বসে রইলেন। কত জীপ গেল। কত বিলাসিনী গেল। কিন্তু রিনা নেই তাদের মধ্যে।

রামচরণ, রামচরণের ছেলে বললে, 'সি মেমটো কোথা গেল বাবাসাহেব ?'

কৃষ্ণস্বামী কী বলবেন ? বলেন, 'কে জানে!'

কে জানে ? সে কোথায় ? কোন দূরান্তরে দূরবিস্তৃত যুদ্ধের সীমানায় রিনা তামসী উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। অথবা অন্ধকারচারী সরীসৃপের মতো। কে জানে ?

৭

পৃথিবী শুধু জল আর মাটি নয়। গাছ বন পাহাড়—এর মধ্যেই পৃথিবীর সীমানা শেষ নয়। তার একটা ঊর্ধ্বলোক আছে। আকাশে মাধ্যাকর্ষণ যতদূর ততদূর তার সীমানা। আবার মাটির বুকের ভিতরে অন্ধকার গহ্বরে তার একটা অধোলোক আছে। সেই মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। বিচিত্র ভাবে এই মাটির তলায় যে বীজ ফাটে, সে মাধ্যাকর্ষণযুক্ত থেকেও উপরের দিকে মাথা ঠেলে ওঠে। গাছের মূল থাকে মাটির নীচে, ফুল ফোটে আকাশে। পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। আকাশে উঠে আরও আরও উপরে উঠতে চায়। কিন্তু তার নীড় মাটির বুকে এ উঁচানো গাছের ডালে, সেখানে তাকে নামতে হয়। সরীসৃপ থাকে মাটির বুকের অন্ধকার গহ্বরে; তাকে উঠে আসতে হয় মাটির উপরে, বায়ুর জন্য, আহারের জন্য, আলোর জন্য।

কৃষ্ণস্বামীর মন বিহঙ্গের মতো আকাশবিহারী। আলো, আরও আলোর জন্য সে ডানা মেলেছে। রিনা ব্রাউনও একদিন সেই পাখা-মেলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। আশ্চর্য মানুষের জীবনের পাপ-পুণ্যের শক্তি, বাবা কেনেথ ব্রাউনের আঘাতে সেই রিনা ব্রাউন অন্ধকার গহ্বরে সরীসৃপ হয়ে গেল। ছেলেবেলা বাল্যজীবনে পুরাণে পড়েছিল একজন রাজা কার অভিশাপে অজগর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে গল্প শুনেছিল কাজলহারার। কাজলহারা ঠিক রিনার মতো শক্তিকে ডানা মেলে, তার সতীন তাকে জাদুদণ্ডের প্রহারে সাপিনীতে পরিণত করেছিল। ব্রাউন পুণ্য অপর্যাদার এই জাদুদণ্ড দিয়ে আঘাত করে তাকে ঠিক সাপিনীই করে দিয়েছে। রিনা উল্কা নয়, সে সরীসৃপ।

কিন্তু পাখিকেও মাটির বুকে নামতে হয়। সরীসৃপকেও মাটির উপরে আসতে হয়। হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই যেন হয়েছিল। কৃষ্ণস্বামীর সঙ্গে রিনা ব্রাউনের এই জীবনের দেখাটা ঠিক যেন তাই। অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপরূপিণী রিনা বিহঙ্গ কৃষ্ণস্বামীর নীড়ে এসে বিষনিশ্বাসে গর্জন করে তাকে শাসিয়ে চলে গেল। আর দেখা হল না।

কৃষ্ণস্বামী কয়েকদিন অন্ধকার রাত্রে সরীসৃপের জন্য প্রতীক্ষা করলেন, কিন্তু সে আর এল না। কোথায় কোন দূরে নূতন অন্ধকার বিহারের সন্ধানে সে চলে গেছে। কৃষ্ণস্বামী পক্ষ বিস্তার করে দিলেন আকাশে। ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে উঠবেন তিনি। রিনা তার পথে গেছে, তিনি তাঁর পথে চলবেন। শুধু মাঝে মাঝে আকাশচারী বিহঙ্গের মাটির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর মতো রিনার কথা মনে পড়লে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, ভগবানের কাছে তাঁর

মঙ্গল কামনা করেন। মঙ্গল করো প্রভু। রিনার চিত্তকে সুস্থ করো, শান্ত করো। কুষ্ঠরোগী এসেছিল তোমার কাছে, তুমি তাকে স্পর্শ করেছিলে। সে নবজীবন লাভ করেছিল। তেমনি করে রিনার চিত্তকে সুস্থ করো। বলো, 'বী দাউ ক্লীন।' আবার কিছুক্ষণ পর রিনার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। অসময়ে বাইসিক্ল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।

'কেমন আছ হে তোমরা সব? আঁ? মহাশয়রা গো?'

'ভালো কোথা বাবাসাহেব? খুদ খেয়ে আর বাঁচে মানুষ, প্যাটের ব্যামো ধরে গেল। ছেল্যা মেয়া ছা-ছিড়ুড়ি সব—সব।'

'দেখছি, দেখছি এস.ডি.ও-কে বলে দেখছি।'

'কিরাচিনি তেল আর কাপড়ের কথা বলবা বাবা।'

'বলব। কিন্তুক এখনই কারুকে হাত-টাত দেখতে হবে নাই ত?'

'ছুরুক-ছারুক অসুখ, ই আর কী দেখবেন গো?'

'ওই বাচ্চাটার পিঠে উ দাগটো কিসের বটে হে? দেখি দেখি।'

হঠাৎ চোখে পড়েছে একটি ছেলের পিঠের ঘাড়ের কাছে একটি বিবর্ণ সাদা দাগ! 'দেখি রে খোকা, ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, শুন শুন।'

'হা ক্যানেরে, হারামজাদা বজ্জাত! দেখা ক্যানে?'

দেখে-শুনে বলেন, 'তাই ত হে মহাশয়, কেমন পারা লাগছেক যেন গো! ইয়াকে ত দেখাতে হয়। নিয়ে যেয়ো ক্যানে আমার উখানে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব।'

আবার রওনা হন। কুষ্ঠের প্রসার দেখে মনে চিন্তিত হন, বেদনা অনুভব করেন। ভুলে যান অন্য সব কিছু।

নিজের মাইক্রোসকোপ কৃষ্ণস্বামীর গোড়া থেকেই আছে, ছাত্রজীবনে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার আওতায় থেকে প্র্যাক্‌টিস করতেন, তখন থেকেই আছে। কম দামে যোগাড় করে দিয়েছিল ক্লেটন। কারবারটা চোরাই মালের তা জেনেই কৃষ্ণেন্দু কিনেছিল। তখন সে ছাত্র-আমলের কৃষ্ণেন্দু। দ্বিধা তার হয়নি। ওটা দিয়ে যখন কাজ করেন কৃষ্ণস্বামী তখন ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেন। সঙ্গে প্রণাম করেন মাকে বাবাকে। মা তাঁর সমস্ত গহনাই দিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণেন্দুকে। সে-গহনা বিক্রী করে সে ঠিক করেছিল বিলেত যাবে। তখনই ঘটল রিনার সঙ্গে জীবন দেওয়া-নেওয়া। এবং তার কিছুদিনের মধ্যে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সে একটা কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো। জেমস ব্রাউন বললে—ক্রীশ্চান হতে হবে। বাবার পায়ে ধরেও মত পেলে না। উন্মত্তের মতো ফিরে এসে রিনাকে জিজ্ঞাসা না করেই ক্রীশ্চান হ'ল। রিনা ঘৃণা ও আতঙ্কভরে মুখ ফেরালে—একটি নারীর জন্যে তুমি তোমার এতকালের ভগবানকে ত্যাগ করেছ কৃষ্ণেন্দু? তুমি ভয়ঙ্কর। না—না। কৃষ্ণেন্দু বের হল সেই ঈশ্বরের সন্ধানে—যে ঈশ্বর রিনার কাছে তার চেয়েও বড়—পৃথিবীর সব কিছু থেকে বড়। টাকাটা থেকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্কে।

আগেকার কৃষ্ণেন্দু ছিল মায়ের গোপাল। সংসারের সব জিনিসে ছিল তারই অগ্র

অধিকার। সে নিতেই জানত, দিতে জানত না। শেখে নি! প্রথম দিতে শিখল, রিনার হাতে নিজেকে দিয়ে। রিনা তাকে ঠেলে দিল ঈশ্বর সন্ধানের পথে। বৈজ্ঞানিক যদি বলে ফ্রাস্ট্রেশনের পথে তো—বলুক, সে একটু হাসবে, প্রতিবাদ করবে না।

থাক রিনার কথা। তার কথা ভাবতে ভাবতে সময়ে সময়ে মনে হয়, রিনা জন্ম থেকেই বোধ হয় পেয়েছিল ঈশ্বরকে; তাকে ফিরিয়ে দেবার সময় তার সেই ঈশ্বরকে নাস্তিক কৃষ্ণেন্দুকে দিয়ে নিজে কাঙাল হয়ে গেল। হিন্দুপুরাণ মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে। তার মায়ের নাম ছিল কুন্তী। কুন্তীর কুমারী-জীবনের সন্তান—কর্ণ কবচকুণ্ডল নিয়ে জন্মেছিল। রিনার জন্মগত ঈশ্বরবিশ্বাসও তাই। কর্ণ কবচকুণ্ডল দান করে মৃত্যুবরণ করেছিল। রিনা ঈশ্বরবিশ্বাস তাকে দিয়ে তামসী হয়ে গেল। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। হে ঈশ্বর, তার জীবনের কবরখানাকে জীবনময় করে তুলে তুমি নূতন করে জাগো। মানুষের প্রাণশক্তির শুভবুদ্ধি, তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকার আলো, হে ঈশ্বর, তুমি জাগ্রত হও। তোমার হাতে রিনাকে সমর্পণ করে কৃষ্ণস্বামী নিশ্চিন্ত। তার কল্যাণের জন্যই কৃষ্ণস্বামী নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করবে তোমার পায়ে, তোমার কর্মে; অন্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রিনাকে নীরোগ কর তুমি; কৃষ্ণস্বামী তোমার সংসারে কুষ্ঠরোগীর সেবা করে তোমাকে সেবা করবে।

এবার কৃষ্ণস্বামীর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। স্বল্পবাক, নির্লিপ্ত মানুষ। আশ্চর্য কঠিন। তবুও তিনি তাঁর সম্পত্তি-বিক্রি-করা টাকা তাঁকেই দিয়ে গেছেন। এক কথায় কৃষ্ণেন্দুকে বলেছিলেন, 'যাও। প্রয়োজন নেই তোমাকে।' বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন ঠাকুর নিয়ে। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। কিছু টাকা এবং ঠাকুরটি মঠে দিয়ে গেছেন। নিজের জীবনের জন্য সামান্য টাকাই খরচ করেছিলেন। বাকি তেরো হাজার কয়েক শো ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, উকিলকে বলেছিলেন, কৃষ্ণেন্দুর খোঁজ করে টাকাটা দিতে। সেটা কৃষ্ণস্বামী পেয়েছেন। তাই থেকেই চলে আশ্রম। এবার আশ্রমটিকে কুষ্ঠ হাসপাতাল করে তুলবেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে একটা কুষ্ঠরোগীর ডিসপেনসারি খুললেন কৃষ্ণস্বামী। আউটডোর।

রিনার মঙ্গল হোক। এই কর্মের মধ্যে রিনার আকর্ষণ ছিন্ন করে দাও।

লাল সিং সিন্ধু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'বাবাসাহেব! ই তো ভাল হচ্ছে নাই।'

কৃষ্ণস্বামী হাসেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করেন, 'তোমারও ভয় লাগছে লাল সিং?'

লাল সিং মৌন থেকে জানায়, হ্যাঁ লাগছে।

সিন্ধু স্পষ্ট বলে, 'হ্যাঁ বাবাসাহেব। মহাব্যাধিকে ভয় কার নাই বলেন? হ্যাঁ—আপনকার নাই বটে। তা আপনার পুণ্য আছে, আমাদের তা নাই। কী করব কন?'

বর্বরা ঝুমকি ভয় করে না। ঘৃণা করে। বলে, 'বড়া খারাপ বামার। গন্ধো কী! উঃ, আর কী হয়ে যায়—থ্যাক থু!'

মধ্যে মধ্যে সেই আমেরিকান মিলিটারী অফিসারটি আসে। এখন আর 'হে ম্যান' বলে না। বলে, 'মর্ণিং রেভারেণ্ড!'

মধ্যে মধ্যে সে রিনার খবরের কথা তোলে। বলে,—ডোণ্ট নো—হোয়ার শী ইজ গন! শী ওয়াজ—ওয়াণ্ডারফুল!' হঠাৎ সেদিন বললে,—'শুনলাম আসাম ফ্রন্টে ঘুরছে। ঠিক তো বলা যায় না। তবে অনেকটা মেলে সেই ড্রেয়ার-ডেভিল মেয়েটার সঙ্গে।'

'আসাম?'

'ইয়েস। গৌহাটি—শিলং। চিটাগং। জাস্ট লাইক হার, লাইক এ শুটিংস্টার।'

সেই মুহূর্তে ঝুমকি এসে দাঁড়াল,—'বাবা সাহেব!'

অফিসারটি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে—'এ যে কৃষ্ণমর্মর-মূর্তি রেভারেণ্ড।'

কৃষ্ণস্বামী মনে করিয়ে দেন, 'এটি আসলে একটি চার্চ, মিস্টার অফিসার!'

সামনে যুদ্ধ! মাথার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা যাদের, তারা যত উদ্দাম তত ভীরু। ঈশ্বরের রোষকে ভয় না করে পারে না। অন্তত পাঁটাতে চায় না ঈশ্বরকে। গায়ে ক্রশ এঁকে সরে যায়।

কৃষ্ণস্বামী লাল সিংকে ডেকে পরদিন বললেন, 'লাল সিং, আমার শরীরটা বড় খারাপ মনে হচ্ছে, আমি কিছুদিন বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথা যাবেন বাবাসাহেব? আপনি না থাকলে ইখানে আমরা কী করে থাকব?'

'পনেরো বুড়ি দিন। তার বেশী নয়। তোমরা গ্রামের মধ্যে যেমন থাক থাকবে।'

পঁচিশ দিন পর ফিরে এলেন কৃষ্ণস্বামী। শরীর সারে নি, বরং শীর্ণ হয়েছে। সিন্ধু বললে, 'শরীর যে খারাপ করা এলেন বাবাসাহেব!'

'অনেক ঘুরেছি সিন্ধু! অনেক কাল ইখানেই থেকে মনটা হাঁপিয়ে ছিল। ছাড়া পেয়ে খুব ঘুরলাম। সেই একেবারে যুদ্ধের লাগালাগি জায়গাতে। শিলং, গৌহাটি, ইখান-সিখান। ঘুরে ঘুরে শরীর খারাপ হবে বইকি! তবে হাঁ, মনটা ভাল হইছে।'

চট্টগ্রাম থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যুদ্ধের লাইনের স্থানগুলিতে খবর নিয়ে ফিরেছেন। হাঁ, খবর পেয়েছেন। ঠিক এমনি একটি মেয়ে ছিল। সে মরেছে। কেউ তাকে খুন করে গৌহাটি থেকে শিলংয়ের পাহাড়ের পথে একটা খাদে ফেলে দিয়েছিল।

সম্ভবত কোনো নিষ্ঠুর সৈনিক। রিনার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। পোস্ট মর্টেমে জানা গেছে, তার পেটে ছিল মদ, আর জানা গেছে যে, হতভাগিনী কদর্যব্যাধিগ্রস্তা ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়েছেন কৃষ্ণস্বামী। রিনা তার জীবনের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে গেছে অথবা নিষ্ঠুর মূল্য দিয়ে এই উল্কা-জীবনের দেনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে গেছে। পুলিস বিচারে তার কোনো পরিচয় পায় নি। কৃষ্ণস্বামীকেই তারা প্রশ্ন করেছিল, 'জানতেন নাকি একে?'

'না। এ সে নয়।'

এই জবাব দিয়েই কৃষ্ণস্বামী চলে এসেছেন। মিথ্যা বলেন নি, এ সে নয়। কিন্তু ঈশ্বর, তুমি কেন তাকে দয়া করলে না। ভাল—তার বিচারের সময় তুমি তাকে দয়া করো।

এইবার,—হে ঈশ্বর, তোমার সেবায় আমাকে মগ্ন করে দাও। সেই সঙ্কল্প নিয়েই ফিরেছেন। কলকাতা থেকে অনেক কষ্টে ওষুধপত্তিও কিনে এনেছেন। সেগুলো সেই দিনই সাজিয়ে ফেললেন। ডুবে গেলেন এই সেবাকর্মে।

* * *

বছরখানেক পর একদিন সকালে ঝুমকি এসে ডাকল।

'বাবাসাহেব।'

'কী?'

'লাল সিং কাল রেতে চলে গেছে।'

'চলে গেছে? সে কি? কোথা গেছে?'

'কে জানে? কিছু বলে যায়নি। বললে, কুষ্ঠ নিয়ে কারবার করে সাহেবের কুষ্ঠ হল, আবার থাকে? চল পালিয়ে বাঁচি।'

'কী বললে? কার কুষ্ঠ হয়েছে?'

'আপনার কুষ্ঠ হয়েছে।'

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে? কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর বুদ্ধি সাড়া দিল। 'কোথায়? কই?'

নিজের হাত-পাগুলি আয়নার সামনে মেলে ধরলেন। ছোট্ট আয়না দেওয়ালে টাঙানো ছিল, সেখানায় মুখটা দেখলেন। কই? কোথায়?

ঝুমকি বললে, 'উঁহু, নয়। যেমন দাগ দেখে তুমি বলিস—কুষ্ঠের লক্ষণ ওটা, তেমনি চাকা-চাকা দাগ একটা উঠেছে যে তুর। পিঠে দিকে। দেখবি কী করে?'

'কোথায়?'

কৃষ্ণস্বামীর জামাটা তুলে পিঠের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ঝুমকি বললে, 'এই যে। এইটা। কি বেড়ে উঠি? না?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৃষ্ণস্বামী। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি যেন খানিকটা অবশ হয়ে গেছেন। আঘাত পেয়েছেন তিনি। এর জন্য প্রস্তুত তিনি ছিলেন না। এর সম্ভাবনা ছিল না এমন নয়, তবু যখন সত্যি সত্যি এল, তখন সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছে; বড় কষ্ট হচ্ছে। হয়েছে। ঝুমকি যেখানকার আঙুল দিয়েছে সেখানকার সাড় নেই, ঝুমকির আঙুলের স্পর্শ তিনি বুঝতে পারছেন না।

হিসা! হিসার কল। কোনো কিছু যেন মনের মধ্যে ধরা পড়েনি। মন ওইদিকে এমনই ব্যস্ত ছিল যে, অঙ্গ নিজের সব কিছুই চোখের উপর দিয়েই তাঁর অলক্ষ্যে চলে গেছে।

মস্তিষ্কের মধ্যে কোষে-কোষে বেদনার আবেগ উদ্বেলিত আগুনের মতো ফেটে বেরুতে চাচ্ছে। কৃষ্ণস্বামী পাহাড়ের মতো তাকে নিজের মধ্যে রেখেছেন। কাঁপতে দেবেন না। ফাটতে দেবেন না। আগুন ধরিত্রীগর্ভে প্রাণের উত্তাপে পরিণত হোক। প্রাণকোষে-কোষে সে-আগুন সহস্র প্রদীপশিখার মতো জ্বলে উঠুক আনন্দ-দীপালিতে ভগবানের আরতিতে।

অনেকক্ষণ পর তিনি আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি ঝুনকি।'

বাঁকুড়ায় নূতন কী বলবে ? বলবে, ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে। অনিবার্য এসেছে। এর পর ? কোথায় যাবেন, কী করবেন ?

হাঁ, এসেছে। কার্যকারণের পরিণাম! কৃষ্ণস্বামীকে তিরস্কারও শুনতে হল। এইভাবে সংঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেষ্টার বাইরে একক চেষ্টা করার অনিবার্য পরিণাম!

চুপ করেই গেলেন কৃষ্ণস্বামী। শুধু একটি হাস্যরেখা ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

লর্ড, আই ক্রাই আন্টু দী : মেক হেস্ট আন্ টু মী।

চিন্তার খুব কারণ আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আর তো এইভাবে লোকের চিকিৎসা করে বেড়ানো ঠিক হবে না আপনার।'

'নিশ্চয়। এ তাঁর নির্দেশ। আসতে আসতে ভেবেছি আমি। আমি চলে যাব। কুম্ভকোণম লেপার অ্যাসাইলামে। সেখানে আমার চিকিৎসাও হবে, আমি ডাক্তার হিসাবে কিছু কাজও করতে পারব।'

'গড বী উইথ ইউ।'

মাদ্রাজ উপকূলে কুম্ভকোণম কুষ্ঠাশ্রম। বিরাট কুষ্ঠাশ্রম। নিপীড়িত ভগবানের সেবায়তন। আজ মনে পড়ল রিনা ব্রাউনকে। স্ফটিকে-গড়া মূর্তির মতো পবিত্র কুমারী রিনা ব্রাউন, আসানসোলের চার্চইয়ার্ডে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার সময় তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসকে, তাঁর ঈশ্বরকে কি এই পথে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল ? না। এই পথ তিনি নিজে বেছে নিয়েছেন ?

সেট্ এ ওয়াচ, ও লর্ড, বিফোর মাই মাউথ : কিপ দি ডোর অব্ মাই লিপস্।

একটা ক্ষুব্ধ বাক্যও যেন কৃষ্ণস্বামী উচ্চারণ না করে।

চলো কুম্ভকোণম। শেষ আশ্রম।

* * *

সত্যের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই ; ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন : সত্যে মৃত মানুষও বাঁচে, কল্পনার কাহিনীতে বাঁচালে অবিশ্বাস্য হয়। বাস্তব জগতে বস্তু থেকে প্রাণ কালোর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সীমানা অতিক্রম করার জন্য যুগ যুগ ধরে ছুটছে, সম্মুখে দিগন্তে আলোর রাজ্য উজ্জ্বল মহিমায় আহ্বান জানাচ্ছে, তবু মানুষের কানের কাছে অবিশ্বাসী বুদ্ধি কূট তর্কে মুখর হয়ে বলছে, আলো নয়, আলেয়া। আলো মিথ্যা, কালোই সত্য। অমৃত কল্পনা, মৃত্যুই সত্য।

আরও আট মাস পর।

কুম্ভকোণম সেবায়তনে সেদিন ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছেন কৃষ্ণস্বামী। এইখানেই তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সবচেয়ে কঠিন রোগের রোগীদের তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর নিজের চিকিৎসাও হয়। রোগ বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়ে এতদিনে তার গতি রুদ্ধ হয়েছে। নাকের পেটি ঈষৎ স্ফীত হয়েছে ; মুখে, কপালে, গালে, অসুস্থ রক্তাভ মসৃণতা দেখা

দিয়েছে; কানের পেটি দুটিও ফুলেছে। হাতের আঙুল ঠিক ফোলে নি, তবে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের মতো দেখায়। প্রথমদিকে দ্রুতবেগেই বেড়েছিল। এখন রোগের গতি রুদ্ধ হয়েছে।

এদিকে কালের পটভূমিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটল। স্বাধীন হচ্ছে ভারতবর্ষ। বিভক্ত হচ্ছে ভারতবর্ষ। কৃষ্ণস্বামী দেখেন, আর নিত্য বলেন, এ-জয় তোমারই জয়! মানুষের মধ্যে সত্যের তপস্যাই তুমি। তোমারই জয়। যা হচ্ছে—তার মধ্যে ছলনা মিথ্যা যতই থাক মানুষের, তার চেয়েও বেশী আছে তোমার দেওয়া সত্যের তপস্যা। আমি জানি। রিনার জীবনের পাপ বড় নয়, প্রায়শ্চিত্ত বড়। আমি জানি। সে জীবন দিয়েছে নিজে। আমাকে দিয়ে গেছে তোমার করুণা। তার আত্মাকে তুমি শান্তি দিয়ো। তার সমস্ত পাপ আমার দেহে ব্যাধি হয়ে তার পাওনা শোধ করে নিক।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে নিজের ঘরে খোলা দুয়ারের পথে তিনি সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। মনে মনে এই কথাগুলিই বলছিলেন। একজন ডাক্তার এসে বললেন, 'রেভারেণ্ড, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি বলেছি আপনার শরীর অসুস্থ, কিন্তু তিনি বললেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, এবং বললেন, বলবেন, আমার নাম জন, জন ক্লেটন।'

'জন ক্লেটন!' বিস্ময়ে চমকে উঠলেন কৃষ্ণস্বামী। জন ক্লেটন সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই লেপার আসাইলামে! 'কই? কোথায়?'

দূরে দেখা গেল শ্বেতাঙ্গ দম্পতি আসছে। কিন্তু—কিন্তু—ও-কে? একি এল?

অকস্মাৎ ঘরগুলো দুলতে লাগল, পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে। সামনের গাছপালা আকাশ আলো সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কী হয়ে যাচ্ছে! জ্যোতির্লোকে যেন বিস্ফোরণ হচ্ছে। ক্লেটনের পাশে ও-কে? কৃষ্ণস্বামী চিৎকার করে উঠলেন, 'রিনা!'

জন ক্লেটনের পাশে রিনা! রিনা। টনের স্ত্রী!

* * *

'হ্যাঁ কৃষ্ণেন্দু। আমি। আমাকে দেখে তোমার বিস্ময়ের কথাই বটে। কিন্তু তুমি, তুমি আমাকে আশ্চর্যভাবে অশরীরীর মতো অনুসরণ করে আমাকে অহরহ ডেকেছ। কাম ব্যাক্, কাম ব্যাক্, ফিরো এসো, ফিরে এসো বলে ডেকেছ। ফিরতে চাইলাম। পালিয়ে গেলামও এলাকা ছেড়ে। কিন্তু কে আমাকে হাত বাড়িয়ে দেবে? কার হাত ধরে আমি আবার মানুষের হৃদয়ের রাজ্যে প্রবেশ করব? তোমার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু পারি নি। ভয়ে পারি নি আমি গুলি করে—'

চুপ করে গেল রিনা। উচ্চারণ করতে পারল না সে-কথা।

কৃষ্ণস্বামীর বিস্ময় কেটে আসছে।

রিনা বললে, 'তুমি বলেছিলে, মানুষের অন্তরে ভগবানের পুত্রকে তার মন্দ বুদ্ধি নিত্য ক্রুশবিদ্ধ করে, নিত্য তিনি নবজীবনে জেগে ওঠেন। অনুভব করলাম এ সত্য। কিন্তু তবু

তোমার সামনে যেতে পারলাম না। তোমার সেই ভয়ঙ্কর কথা আমার কানে বাজত। তুমি বলেছিলে, আমি এখানে থাকব টু বী ক্রুশিফায়েড এগেন। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সেইন্ট, তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে কলুষিত করতে পারি তোমাকে? কিন্তু—'

চোখ দিয়ে ঝিনার জল গড়িয়ে এল।

জন ক্লেটনও যেন সেই কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু জনি নয়। অথবা কৃষ্ণস্বামী কৃষ্ণেন্দু নন। জন ক্লেটনও তাঁর সঙ্গে সম্ভ্রমভরে কথা বলছে। অবশ্য ক্লেটনও আর সে-ক্লেটন নয়। সে পরিণত-বয়স্ক মানুষ। গোড়া-খাওয়া মানুষ। অনেক দুঃখ পেয়েছে। প্রথম স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ করে চলে গেছে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চলের বন্দীশিবিরে কাটিয়েছে। আজও তার দেহ শীর্ণ। ভিতরে বাইরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। ক্লেটনের কানের পাশে গুলির দাগ। কপালে সারিসারি রেখা দেখা দিয়েছে। কণ্ঠস্বর তার শান্ত। তার জীবনেও বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ক্লেটন বললে, 'যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম। মুক্তি পেয়ে ফিরে কিছুদিন পর গেলাম কাশ্মীর। শরীরটা একটু সুস্থ হবে। মনে ক্লান্তির সীমা নেই। হঠাৎ কাশ্মীরে দেখলাম রিনাকে। ঝড়ে ডানাভাঙা বোবা-হয়ে-যাওয়া পাখি দেখেছ কৃষ্ণেন্দু?'

হেসে ক্লেটন বললে, 'তোমাকে কৃষ্ণেন্দু বলতে বাধছে রেভারেন্ড। তুমি সত্যই পবিত্র।'

কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'একমাত্র ভগবানই পবিত্র ক্লেটন। যারা জীবনের বেদনাকে তাঁর পায়ে ঢেলে দেবার জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ পড়ে তাদের পবিত্র মনে হয়। নইলে তারাও মানুষ ক্লেটন।'

বিচিত্র হেসে তারপর বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম, রিনা শিলঙ ফ্রন্টে। এখানকার একটি আমেরিকান অফিসার বলেছিল—রিনা শিলঙে। সেখানকার কে এক অ্যাকসার তাকে একটি উন্মত্তপ্রায় মেয়ের কথা বলেছিল। তার ধারণা হয়েছিল—সে রিনা। আমি শিলঙে গেলাম। ওকে ফিরিয়ে আনব জীবনে। গিয়ে শুনলাম সে মেয়েটি মরেছে। তাকে কে রাত্রে খুন করে খাদে ফেলে দিয়েছিল।'

রিনা সজল চক্ষে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কৃষ্ণস্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'কত খাদে, কত জঙ্গলে, এমন কত হতভাগিনীর জীবন শেষ হয়েছে, দেহ শকুন-শেয়ালে খেয়েছে, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসেব নেই। আমারও যেত কৃষ্ণেন্দু, যদি সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হত, যদি তোমার স্মৃতি আমার পিছনে দেবদূতের মতো অহরহ না ফিরত—তবে আমারও ওই হত। আমি পিয়ারা-ডোবা থেকে পালিয়ে গেলাম সেই রাত্রে। সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই ক্যাম্পের দিকে যেতে যেতে গেলাম না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দুলছে, কাঁপছে, ভেঙে পড়ছে; ভেঙেচুরে আর একরকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল ক্যাম্পের মধ্যে আকাশের মেঘের মতো পুঞ্জপুঞ্জ বিরক্তি তিক্ততা জমে উঠেছে—ঘুরপাক খাচ্ছে। ওখানকার মানুষগুলোকে বীভৎস কুৎসিত মনে হল। কি যে মনে হয়েছিল ঠিক বলতে পারব না। তবে ওপথে যেতে যেতে অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল—না। ওখানে নয়! না—না—না।'

'দাঁড়ালাম। তারপর দুরন্ত রাগ হল তোমার উপর। ফিরলাম দুরন্ত রাগে—তোমাকে খুন করব। দেখলাম তুমি সেই জলের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ পথের দিকে তাকিয়ে। বুঝলাম—আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ। মুহূর্তে আমি সাহস হারালাম, রাগ হারালাম; কাঁপতে লাগলাম। থর থর করে কেঁপেছিলাম। কেঁদেছিলাম। তারপর ভেবেছিলাম—মুখে রিভলবারের নল পুরে গুলি করে উন্মত্ত যন্ত্রণাজর্জর জীবনটাকে শেষ করে দেব। কিন্তু তাও পারলাম না। তুমি পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য শক্তি তোমার সেই স্থির মূর্তির। আশ্চর্য শক্তি। তারপর তুমি চলে গেলে আমি পালালাম। ছুটে পালিয়েছিলাম মাইলখানেক। তারপর একখানা জিপ পেয়েছিলাম। ব্যাঙ্কুরা এসে ট্রেন ধরলাম। কোথায় যাব? স্থির করলাম অনেক দূরে যাব। অনেক দূরে। প্রচণ্ড উন্মত্ত কোলাহল—ভয়—পাশবিকতার মধ্যে, মরণ নিয়ে খেলার মধ্যে—যেখানে ভাববার অবকাশ নেই। আছে মরা আর মারা; অল্প অবসরের মধ্যে নেশা আছে, খাওয়া আছে—আর আছে উন্মত্ত দেহভোগ। এলাম আসামে। শিলংয়ে আমি যাই নি—আরও সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলাম। যখন পৌঁছুলাম,—তার আধ ঘণ্টার মধ্যে হল একটা এয়ার-রেড। একটা মাটির গর্তে লুকিয়েছিলাম। রেড শেষ হল। তখন কিছু হটার হুকুম হয়েছে। একজন অফিসার আমাকে জীপে নিয়ে নিলে মরণের মুখে ভোগলালসার। রাত্রের সে অভিজ্ঞতা আমার চিরস্মরণীয়—আমি ভুলব না। অরণ্যভূমের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছিল। আমি দেখলাম একা তুমি সহস্র হয়ে চারপাশে ঘিরে রয়েছ আমাকে। তারপর চাঁদ ডুবল। অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকলো, অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান যখন হল তখন শেষ রাত্রি। দেখলাম পড়ে আছি একা, ঝোপের কিনারায়। আর তুমি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ। হ্যাঁ তুমি। নির্ভুল তুমি। আমার পিস্তলটা সঙ্গেই ছিল। আমি গুলি ছুঁড়লাম, তুমি নড়লে না। একবার কাঁপলে না, ধরেই রইলে। মনে হল, বললে—'আই অ্যাম হিয়ার টু বী ক্রুসিফায়েড এগেন'—আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আবার যখন জ্ঞান হল—তখন আমি হাসপাতালে। শুনলাম খাদের ধারে আমি একটা গাছে আটকে ছিলাম। নিচে আড়াই হাজার ফুট খাদ। কিন্তু আমি জানি—গাছ সে নয়, হতে পারে না। আজও জানি। সে তুমি। অস্থির অধীর হয়ে উঠলাম। কোথায় যাব? কোথায় গেলে তোমার এই অশরীরী অনুসরণ থেকে রেহাই পাব! ফ্রন্টের আবহাওয়া—ওই ভোগসর্বস্ব মানুষ তখন অসহ্য হয়েছে। তারা যেন রাক্ষস। হ্যাঁ, সমস্ত জীবনের ক্ষুধা পুঞ্জীভূত করে তখন তারা রাক্ষসের মতো বুভুক্ষু।

'ওদের নাগালের বাইরে দূর-দূরান্তরে সরে যেতে চাইলাম। ওদিক থেকে আমি চলে এসে পালালাম সিমলার দিকে। সেখান থেকে কত জায়গা। ক্লান্ত শ্রান্ত। দেহ ভেঙেছে মন ভেঙেছে—চাইলাম বিশ্রাম। শুধু বিশ্রাম। শুধু মদ খেতাম। আমি তখন কখনও মরে বাঁচতে চাই, কখনও আবার দারুণ ক্ষোভে উল্কার মতো ছুটতে চাই। কিন্তু যতবার এগিয়েছি—ততবার ওই খাদের ধারে গাছের মধ্যে তোমাকে দেখার মতো, কিছু না কিছুর মধ্যে তোমাকে দেখেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়েছ। উঃ! কতবার ওয়ার-জোনের দিকে অর্ধেক পথ গিয়ে ফিরে পালিয়ে এসেছি এমনি ভাবে তোমাকে দেখে। তারপর গেলাম

কাশ্মীরে। তখন আমি অর্ধমৃত। কিন্তু তবু রেহাই নেই। পিছনে লাগল বুভুক্ষু সৈনিক। একদিন মদ খেয়ে আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। মাতাল হয়ে পড়ে গেলাম। একটা নির্জন জায়গায়, ছুটো জানোয়ার আমার সঙ্গ নিয়েছিল—তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

স্তব্ধ হল রিনা। আর সে বলতে পারছে না।

কৃষ্ণস্বামীও স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছেন, গভীর রাত্রে শান্ত সমুদ্রের মতো।

ক্লেটন বাকীটা শেষ করলে। ওইখানেই রিনার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর সামরিক শাসনের ভয়ে তারা ফিরতে বাধ্য হল। রিনা তখন প্রায় অজ্ঞান, আর শুধু বিড়বিড় করে বকছে আপন মনে। তারা শবের কাছে আনন্দ পায় নি, তাকে ফেলে চলে যাবার সময় তাকে লাথি মারছিল। ক্লেটন আসছিল সেই পথে। সে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়। অফিসারস্ ব্যাজ দেখে তারা পালায়। ক্লেটন দেখে শিউরে ওঠে।

রিনা! রিনা! হ্যাঁ, এই তো রিনা।

সে ডেকেছিল, 'রিনা, রিনা।'

রিনা বিড় বিড় করে বকেই গিয়েছিল। ওরা যা বুঝতে পারে নি—ক্লেটনের তা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। রিনা বকছিল, 'ইট ইজ দি কজ্, ইট ইজ দি কজ্ মাই সোল!'

আর সন্দেহ থাকে নি, এই রিনা ব্রাউন! রিনাকে সে কাঁধে করেই প্রায় তুলে এনেছিল। বার বার কানে কানে বলেছিল, 'রিনা মাই ডার্লিং, রিনা মাই লাভ, রিনা মাই এঞ্জেল! আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'

রিনা চিৎকার করে বলেছিল,—'লীভ মি—লীভ মি—লীভ মি কৃষ্ণেন্দু! দি গেটস অব হেভেন্‌স উইল বি ক্লোজড টু ইউ ফর মি—ফর মি। আই ডোণ্ট লাইক টু গো টু হেভেন্‌স। লীভ মী!'

এক মাস প্রাণপণে সেবা করে চিকিৎসা করিয়ে রিনাকে সে সুস্থ করে তুলেছিল। রিনা বিস্মিত হয়েছিল।

ক্লেটন রিনাকে বলেছিল নিজের কাহিনী। তারপর বলেছিল, 'প্রথম যৌবনের সে-আমি দুঃখের আগুনে পুড়ে গিয়েছে। গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়; যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। আমি তোমাকে এইটুকু বলি রিনা, ট্রাই মি, পরীক্ষা করে দেখ আমাকে। আর যদি বলো চলো তোমাকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে নিয়ে যাই।'

চমকে উঠেছিল রিনা।—'কার কাছে? না—না—না—। বলো না, বলতে নেই। সে সেইণ্ট!'

* * *

রিনা বললে, 'কী করব? তোমার পাশে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমার তখন নেই। আমি ওকেই বিশ্বাস করলাম। এবং সে তো প্রমাণ করলে। সে ভালোবাসাকে প্রমাণ করলে। দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলে কৃষ্ণেন্দু, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে। সেটা এল ওর মধ্য দিয়ে। তুমি সেইণ্ট কৃষ্ণেন্দু। তুমি

সেইন্ট।'

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমার দুঃখ রইল, তোমার এই অবস্থায় তোমার সেবা করতে পারলাম না!'

কৃষ্ণস্বামী সামনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'এই হয়তো আমার পুরস্কার রিনা। এই দিয়েই তিনি আমার সব অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত করে দিলেন।'

এবার হাসলেন, হেসে বললেন, 'দেখো, আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, একসঙ্গে সাত পা হাঁটলে মিত্রতা হয়। আমাদের বিবাহে স্বামী-স্ত্রীতে অগ্নি সাক্ষী করে, সাতপা একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু যখন ভগবানকে খোঁজে মানুষ, তখন সে একা, কারুর সঙ্গেই সাত পা হাঁটা যায় না। বন্ধুর সঙ্গেও না। একা। সে-পথে বিচিত্রভাবে আসে আশীর্বাদ, অভিশাপ! এবং—! সাত পা একসঙ্গে না হাঁটলে সংসারের আনন্দে ফেরা যায় না। তোমরা হেঁটেছ, দোর খুলেছে। সুখে তোমাদের সংসার ভরে যাক। আমার যাত্রা—অ্যালোন! আমি সুখী।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

রেটন সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, 'আমরা আবার আসব। আমি বিলেতে ফিরে যাচ্ছি না। রিনাকে নিয়ে এখানেই ঘর বাঁধব। বার বার আসব।'

'এখানে থাকবে তোমরা? তা হলে—তা হলে আমি একটা অনুরোধ করব। রিনা, তুমি আমার আশ্রম জান। সেখানে স্বর্ণা বলে একটি অনাথা মেয়ে আছে—তাকে তোমাদের সংসারে নিও। আচ্ছা। আর নয়। জন, ইউ আর এ মেডিক্যাল ম্যান। চলে যাও, আর না। গুড বাই! গুড বাই। কেঁদো না, নো-নো-নো। আমি দেখতে চাই তুমি হাসছ। স্মাইল মাই চাইল্ড। দেখো, আনন্দ ছাড়া আর কিছু কি আছে? গুড বাই! গুড বাই! গুড বাই!'

দীর্ঘ হাতখানি তুলে দীর্ঘকায় পুরুষটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থির কিন্তু। এ ওদের বিদায় সম্ভাষণ দিচ্ছেন, না শূন্যলোকে অদৃশ্য ঈশ্বরের পা দুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছেন—সে কৃষ্ণস্বামীই জানেন।

পরিশিষ্ট

কিছুকাল আগে রেডিয়ো থেকে কয়েকজনকে 'মনে রাখার মত মানুষ' এই পর্যায়ে নিজের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়েছিল। এই পর্যায়ের কথিকাগুলি সত্যই একেবারে বিস্ময়কর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। ইংরেজীতে যাকে বলে Truth is stranger than fiction ; কিন্তু যিনি fiction রচনা করেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্য অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর fiction-ভুক্ত বা তার অঙ্গীভূত হয়ে বসে থাকে। অবশ্য যদি সে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য সত্য-কল্প না হয়। পৃথিবীর সব লেখকই এই বিচিত্র বিস্ময়কর সত্যের মধ্য দিয়ে সেই জীবন-সত্যকে খুঁজে বেড়ান, স্বর্ণসন্ধানী বা মণিমাণিক্য-সন্ধানী দুঃসাহসীর মতো। সে সন্ধান যার মেলে সে-ই ফকির থেকে হয় ধনী। এর সন্ধানেই বড় বড় লেখকেরা মানুষের মেলার মধ্যে বিহ্বলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখবার উদ্দেশ্যে ঘোরেন না, দেখবার উদ্দেশ্যেই ঘোরেন। লণ্ডন প্যারিসের পথে-গলিতে, রাশিয়ার শহরে-গ্রামে ব্ল্যাক-সীর তটভূমিতে বড় বড় লেখকেরা ঘুরেছেন, দেখেছেন। যাঁরা পূর্বকালে এদেশে মহাকাব্য লিখেছেন তাঁরা পদব্রজে ভারতের হিমালয় থেকে সমস্ত নগরগ্রাম অরণ্যভূম পরিভ্রমণ করেছেন। এই সত্য মিলে গেছে এমনই বিচিত্র মানুষের জীবন-সত্য থেকে। আমারও এ স্বভাব ছিল, আজও আছে। এককালে বাংলার মেলায় মেলায় ঘুরেছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এখনও ঘুরি। এমনি ঘোরার মধ্যে দেখা পেয়েছিলাম একজন মনে রাখার মতো মানুষের। আমি লেখক, আমার মনে রাখার মতো মানুষ মনেই থাকেনি—আমার মনের সাগরে অবগাহন করে আমার লেখার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সপ্তপদী সৃষ্টির এই বিচিত্র সত্যটি—ইদানীং কালে আমার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব-বৈচিত্র্য অনুসারী। এবং সত্য সত্যই এক্ষেত্রে Truth is stanger than fiction.

সপ্তপদীর সমাদর হয়েছে। এবং গল্পের নায়কের অস্তিত্ব ও সত্যের কথা রেডিয়ো-শ্রোতাদের কাছে বলেছি ও প্রবন্ধের বইয়ের মারফৎ পাঠকদের কাছেও হাজির করেছি। সেইটুকু পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করছি।

মানুষের বাস্তব জীবনে রাম মেলে না কিন্তু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মেলে—মহাত্মা গান্ধী মেলে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেলে—আমার জীবনেই মিলেছে। তাঁরা তাঁদের কর্মে কীর্তিতে ইতিহাসের পাতার মারফতে চিরকাল মানুষের মনে থাকবেন। যারা না দেখেছে—তারাও রাখবে। কিন্তু এ-ছাড়া কিছু মানুষ আছে যাদের ছবি ওঁদের ছবির নিচের সারিতে ঝুলানো থাকে, যাঁরা একান্তভাবে আমার কালে আমার মনেই অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমার মুখে বা আমার লেখার মধ্যে আঁকা তাঁর ছবি হয়তো অনেক লোকের মনেই আঁকা হয়েছে। কতদিন তা উজ্জ্বল থাকবে তা বলতে পারিনে, সে নির্ভর করছে আমার লেখার সার্থকতার উপর। তবে সে মানুষ আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন। আমি লেখক বলেই এ-কথা বলছি। আমার কাছে মনে রাখবার মতো মানুষ যারা—আমার লেখার মধ্যে অবশ্যই রূপ নিয়েছে। একলশী ডোমই কি কম বার এসেছে ফিরে ফিরে! আজ বিশ্লেষণ-বিচার

করতে গিয়ে দেখছি—নিজেই আমি ছদ্মবেশ নিয়ে বেশিবার এসেছি। সে আমার নিজের কথা বলেছি। সে মনে রাখার মতো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু প্রথম থেকেই একটি মানুষ অমৃত-ভরা স্বর্ণপাত্রের মতো আমার চোখের সামনে ভাসছেন।

ক'দিন বা দেখা, কতটুকু বা পরিচয়, হিসেব করে বলতে বললে বলি—

১৯১৬ সালে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম। পড়বার সুযোগ হ'য়েছিল মাস ছয়েক। সেই সময় অতি দৃপ্ত প্রচুর উল্লাসে ভরা কলেজ মাতানো একটি লম্বা ছেলেকে দেখেছিলাম। তার পদক্ষেপ বলে দিত—এ আর কেউ নয়, সে; বহু কলরবের মধ্যে একটি সবার উপরে ছাপিয়ে উঠত, শুনেই বুঝতাম সে, খেলার মাঠে গোলের মধ্যে বল নিয়ে ঢুকে গেল যে—সে আর কেউ নয়, সে—সে। যেন একটা ঘূর্ণাবর্ত। বোধ হয় ফোর্থ ইয়ারে পড়ত। আমাদের থেকে বয়সে বড়, কথা বলবার কোনও হয় নি—সুযোগও হয়নি। কলেজের দক্ষিণদিকে তখন জুনিয়ার ও সিনিয়ার কেম্ব্রিজ ইস্কুল—সেখানে পড়ে বড় বড় লোকের ছেলে আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ছেলে। মধ্যে মধ্যে দেখি সে তাদের মধ্যে বসে সিগারেট খায়। হঠাৎ গুজব শুনলাম ওই ছেলেটি ক্রীশ্চান হচ্ছে। সেকালে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। হিন্দুর ছেলে ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছে? ছি—ছি—ছি। অকপটেই আজ স্বীকার করব যে সেকালে ক্রীশ্চান ধর্ম ইংরেজদের ধর্ম—ইংরেজদের ধর্ম বলে তার উপর সাধারণভাবে হিন্দুরা প্রীত ছিল না। তাছাড়া প্রতি ধর্মেই একটা গোঁড়ামি আছে। এবং তার মধ্যে আমাদের ধর্মের বিধিনিষেধের কঠোরতার সঙ্গে বিশেষ বেশী এ-কথা অস্বীকার করব না।

আরও ছি-ছি করে উঠলাম যখন শুনলাম ক্রীশ্চান ধর্ম সে গ্রহণ করবে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করবে বলে। তারা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছে। কিন্তু মেয়েটির বাপ বলেছেন—ক্রিশ্চান না-হলে তিনি এ-বিবাহে মত দেবেন না। তাই সে বলেছে—ভাল কথা—ক্রীশ্চানই সে হবে।

এবার সে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের পটভূমি থেকে মুছে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আর সে দুপদাপ পদধ্বনি শোনা যায় না, কণ্ঠস্বর শোনা যায় না; খেলার মাঠে লম্বা একটি ফেলোয়াড়কে বল নিয়ে নেটের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখা যায় না। শুনলাম—বিয়ে করে রেলে-টেলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

বাস—মুছে গেল সে কলেজ-স্মৃতি থেকে। আমিও ক'মাস পর পুলিসের তাড়ায় পড়া ছেড়ে গ্রামে এলাম। বাড়িতে অন্তরীণ হলাম। দিনে দিনে বিস্মৃতির স্থূল অন্ধকার সে আমলের দেখা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তাকে গ্রাস করল—যেমনভাবে মাটির স্তর গ্রাস করছে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সঙ্গে কত নামহীন গ্রামকে কত কুটিরকে। মনের বিস্মৃতির গ্রাস বোধ করি আরও বিচিত্র। আমার একটি গল্প আছে—এক তরুণ যাত্রাদলের গায়ক একটি গ্রাম্য তরুণীকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মিলন তাদের হল না। দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রাদলের গায়ক—তখন সে প্রবীণ, এলো সেই গ্রামে গাওনা করতে; সেই মেয়েটি তখন গৃহিণী-জননী-প্রৌঢ়া-স্থূলাঙ্গী: যাত্রাদলের গায়ক যতক্ষণ আসরে গান করলে ততক্ষণই সতৃষ্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

খুঁজলে—তাকে যদি দেখতে পায়। মেয়েটি সামনেই বসে গান শুনছিল। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারলে না। বাহির সংসারে মানুষ মরলে তাকে পুড়িয়ে ছাই করি, মাটির তলায় কবর দি। মনের সংসারে মানুষ জীবিতকেও মাটির তলায় চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তাকে বোধ করি মাস কয়েকের মধ্যেই কবর দিয়েছিলাম মনের মধ্যে।

এর চল্লিশ বৎসর পর। ১৯৫৬ সাল। বিশেষ কারণে স্থান এবং পাত্রের নাম গোপন রেখেই বলছি—সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে—ভারতবর্ষের প্রায় এক প্রান্তসীমায় গিয়েছিলাম সভাসমিতির নিমন্ত্রণে। যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম তিনি একদা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। আমারও সমবয়সী। জীবনের পরিচয় আদান-প্রদানের সূত্রে প্রকাশ পেল যে তিনি এবং আমি একই সালে, একই কলেজে, একই শ্রেণীতে পড়েছি। মুহূর্তে পরস্পরে বেশ একটু নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে অতীতকাল সাড়া দিয়ে উঠল। সেই কলেজ জীবনের কথা ছোটখাটো টুকরো টুকরো বেরিয়ে আসতে লাগলো। যেন প্রবল একটা বর্ষণে মাটি ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে—কয়েকটা কাঁচের বা শাঁকের চুড়ির টুকরো, কোনো একটা ভাঁড়ের ভাঙা কানাটা হয়তো বা গোটাই একটা খুরি বা পাথরের শীল। একে মনে আছে? ওকে? আছে বই কি। সেই তো রোল নম্বর একশো—কি এক? দাঁত দুটি উঁচু। কপালে চুলের একটা ঘূর্ণি?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আর তাকে?

—কাকে বলুন তো? কেমন দেখতে?

একদিন তাঁর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে জীপে ঘুরছি, দুধারে বন আর পাহাড়, হঠাৎ এক জায়গায় এসে প্রশ্ন করলেন—একে মনে আছে? আমাদের সময়ে কোর্থ ইয়ারে পড়ত, লম্বা কালো—হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখত সব। মেম বিয়ে করবার জন্যে ক্রীশ্চান হয়েছিল?

বললাম—আছে বৈকি!

—দেখবেন তাকে?

—এখানে কোথায় সে?

—চলুন, দেখবেন।

জীপকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন একখানি গ্রামে। পাহাড়ের কোলে—আদিবাসীদের গ্রাম। তার মধ্যে কাঠে তৈরী একটি চার্চ। সেই চার্চের পাদরী, একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় মানুষ—মুখে আশ্চর্য প্রসন্ন হাসি। গ্রামের ছেলেদের পড়াচ্ছেন।

বললেন—উনি।

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—উনি?

—হ্যাঁ। কিছুদিন হল ওঁকে আবিষ্কার করেছি—কথায় কথায় পরিচয় হল—জানলাম উনিই তিনি।

সেই প্রচণ্ড দুর্দান্ত হৈ হৈ-করা ছেলে—যে একটি নারীর জন্যে ধর্ম-বাপ-মা সব বিসর্জন দিতে পারে—সেই ইনি। শান্ত-প্রসন্ন-মধুর।

বন্ধু বললেন—একটা ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত।

—মেয়েটি মরে গেছে ?

—না। ঘটেছিল কি জানেন ; এই যে ক্রীশ্চান না হলে বিয়ে দেবে না, এ জেদ ছিল বাপের। মেয়েটি তা চায়নি। সে চেয়েছিল তিন আইনে বিয়ে হোক। ইনি ধর্ম মানতেন না, জাত মানতেন না। ইনি ক্রীশ্চান হলেন, নিজের থেকে। এবং গিয়ে বললেন—আমি ক্রীশ্চান হয়েছি। আর তো বাধা নেই।

মেয়ের বাপ বললেন—না।

কিন্তু মেয়ে সমস্ত শুনে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—তুমি আমার জন্যে ; আই মীন একটি মেয়ের জন্যে, তোমার ঈশ্বর, তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে ?

উনি খুব উৎসাহের সঙ্গে হেসেছিলেন—বলেছিলেন—আমার জীবন দিতে পারি তোমার জন্যে।

মেয়েটি বলেছিল—মাফ কর আমাকে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি আমার জন্যে এতকালের ঈশ্বরকে ত্যাগ করলে। কাল আমার থেকে কোনো সুন্দরী মেয়ে তোমার ভালো লাগলে আমাকে ত্যাগ করবে না কে বললে ?

মেয়েটি ওকে বিয়ে করেনি। কোনো মতেই রাজী হয়নি। বাপ-মায়ের অনুরোধও রাখেনি।

উনি চলে এলেন মর্মাহত হয়ে। সারারাত ভাবলেন। স্থির করলেন—ঈশ্বর এত বড় ? এত প্রিয় ? যার জন্যে সংসারের প্রিয়তম জনকেও উপেক্ষা করা যায় ? তাহলে তিনি তাঁকেই খুঁজবেন। তাঁর সেবাতেই জীবন নিয়োগ করবেন। সেই থেকে উনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রথমে ছিলেন—গারো পাহাড়ে ; সেখানকার আদিবাসীদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করেছেন। পাকিস্তান হবার পর এখানে এসেছেন।

বললাম—সেই মেয়েটি ?

—তার খবর উনি আর রেখেননি, রাখেননি।

আমার মনে হল—আমার অন্তর্লোকের সকল স্তর ভেদ করে এক অতি-সাধারণ—অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। অট্টহাসের বদলে প্রসন্ন ধীর হাস্যে সুপ্রসন্ন, দুর্দান্তপনার পরিবর্তে পরম প্রশান্ত, উল্লাস-চঞ্চলতার অধীরতার পরিবর্তে শান্ত ধীর।

মনে পড়ল বিখ্যাত উপন্যাস কুয়ো ভেদিস।

—Where goest Thou Lord !

উত্তর হল—To Rome, to be crucified again !

অল্প কয়েকটি কথা বলেছিলাম। উত্তরে কথা পেয়েছি অল্প। কিন্তু প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্যে যেন অমৃত, ধারায় স্নানপুণ্য অনুভব করেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঈশ্বর পেয়েছেন ?

শুনেছিলাম—পেয়েছি বইকি। নইলে এত আনন্দ পাই কোথা থেকে।

ফিরে এলাম। আমার মনের স্মৃতির ঘরে একটি অতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ জ্যোতির্ময় প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। ঐতিহাসিক বিরাট পুরুষদের ছবির সারি

অনেক উঁচুতে টাঙানো। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয়। এঁর ছবি ঠিক তাঁদের নিচেই ঝুলছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াই। আমার কাছে যিনি অবিস্মরণীয়—তিনি আমার লেখার মধ্যে দেখা না দিয়ে তো পারেন না। সপ্তপদীতে তিনিই কৃষ্ণেন্দু হয়ে দেখা দিলেন।

*   *   *

বাকী থেকে গেছে নায়িকার কথা। নায়িকার নাম রিনা ব্রাউন। অবশ্যই কাল্পনিক নাম। এবং কৃষ্ণেন্দুর হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তাকে আমি দেখিনি। কথাও বিশেষ শুনিনি। রিনা তবু পুরো কাল্পনিক নাম। এ ক্ষেত্রে গল্প একটু সত্য—যা রূপকথার রাজকন্যার খসে-পড়া একগাছি সোনার বর্ণ চুলের এক অপরূপাকে মনে করিয়ে দেবার—যা আমি পেয়েছিলাম তাই বলি। আসল মানুষটি এবং কৃষ্ণেন্দু যেমন এক নয় উপন্যাসের রিনা ব্রাউনও তেমনি সেই অসাধারণ মেয়েটি নয়—যে বলেছিল বা বলতে পেরেছিল, 'আমার মোহে তুমি যখন তোমার এতদিনের ধর্ম এতদিনের বিশ্বাসের ভগবানকে ত্যাগ করছ তখন কে বললে আমার থেকে সুন্দরী কাউকে দেখলে তাকে পরিত্যাগ করবে না।' পূর্বেই বলেছি তাকে আমি দেখিনি তাকে আমি জানি না। যা ঘটেছিল তাতে সেই মেয়ের পক্ষে একমাত্র চিরকুমারী থাকাই উচিত। সত্য ক'রে এই মেয়ের কি হয়েছিল বা হয়েছে তা সেই পাদরীও জানেন না। বাস্তব সত্য, গল্প উপন্যাসের কল্পনার বিচিত্র সত্য থেকেও অদ্ভুত। হয়তো অবিশ্বাস্য। লিখতে বসে রিনার চরিত্র নিয়ে বেশ ভাবনায় পড়েছিলাম। হঠাৎ একটি দেখা, মাত্র কয়েক বারে কয়েক ঝলক দেখা একটি ইংরেজ বা আমেরিকান বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংরিজীবাসিনী এক বিচিত্র বিদেশিনী মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার কয়েকটি কথা এবং ছবি মনের মধ্যে ভাসছে।

১৯৪৪ সালে পুরীর সমুদ্রতীরে তাকে প্রথম দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে—চোখের পাতাগুলি ঘন কালো এবং ফুলের কেশরের মতো দীর্ঘ। মাথার চুলে ঘনকৃষ্ণ শোভাই শুধু নয়—বিষুবরেখার অধঃস্থ খাদের ঘন বর্ণাঢ্যতা এবং সমৃদ্ধি তার রক্তের ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য বহন করছিল। তার পরনে স্ল্যাক; গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, মাথায় একখানা গাঢ় লাল রঙের রুমাল। উচ্চ হাস্য-প্রমত্ত কণ্ঠস্বরে অস্থির পদক্ষেপে ঝড়োজীবনের ইঙ্গিত আর ইঙ্গিত ছিল না—স্পষ্ট পরিচয় হয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। একমুহূর্তে পুরীর সমুদ্রতটের সকল মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হত। সঙ্গে অবশ্যই অহরহ কেউ-না-কেউ যুদ্ধের পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ থাকতই। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্রতটে তাকে তীব্রকণ্ঠে বলতে শুনেছিলাম—বোধকরি তার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল—সে বলেছিল—What do I care for God ? I am no Christian. My father did not baptize me. He was ashamed of me. I hate you. Yes I hate you. Your heaven is not my heaven. My heaven is hell. My God is the God of hell.—বর্বর মাতাল সৈনিকটা তাকে মেরেছিল মুখের উপর। ইংরেজের আমল, যুদ্ধের কাল, বি-এন-আর হোটেলের এলাকা—কয়েকজন এদেশের লোকের সঙ্গে আমিও ছিলাম—কিন্তু কেউ কিছু বলেনি, বলতে সাহস করেনি এবং অনধিকার চর্চাও মনে

হয়েছিল। পরদিন আবার তাকে দেখেছিলাম—মুখে তার কালসিটের দাগ ; ঠোঁটটা ফুলে গেছে। সমান উৎসাহে প্রমত্ত পদক্ষেপে ঘুরছে। সর্বনাশের পথের যাত্রিনী।

এই মেয়েকে কলকাতাতেও চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখেছি। একদিন একা ময়দানে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি নিশ্চল প্রতিমার মতো ; তখন অপরাহ্ণ বেলা। কি ভাবছিল কে জানে। তার স্বর্গের কথা ? তার ঈশ্বরের কথা ? তার জীবনের কথা ?

তারপর তাকে দেখি শিলংয়ের পথে। বছর দেড়েক বাদে। এই সময়ের মধ্যেই তার জীবন দেহ অমিতাচারের ফলে দীর্ণ হয়েছে পোকা-ধরা লতা'র মতো।

এর চেয়ে ভাল বাস্তব উপমা মনে হচ্ছে না। এই কিছুদিন আগে বোধ করি মাস ছয়েক হবে একটি ভালো অপরাজিতার লতা এনে বাড়িতে পুঁতেছিলাম। প্রথম সে বাড়তে লাগল ঘন সবুজ বর্ণে, চওড়া পাতার পর পাতা মেলে ; মোটা সরস ডাঁটার সর্পিল বিস্তারে। চোখ জুড়িয়ে যেত। হঠাৎ গাছটায় পোকা ধরল। পাতা ছোট হল—কুঁকড়ে যেতে লাগল, ডাঁটা শীর্ণ হল—শিরা-ওঠা হাতের মতো লম্বা রেখা জাগল তাতে, পাতা ডাঁটার বর্ণে এমন একটা কিছু মিশল যা দৃষ্টিকে পীড়িত করে। এই মেয়েটির অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি। গৌহাটি থেকে এক বাসে যাচ্ছিলাম। তার সঙ্গে ছিল একটি তরুণ যার বয়স তার থেকেও অনেক ছোট, দুগ্ধপোষ্য না হোক নিতান্তই কিশোর একটি, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে, মেয়েটাই তাকে পাকড়েছে বা কিশোরটি যুদ্ধক্ষেত্রের আবহাওয়ায় তার কাঁচামাটির পেয়ালার মতো কাঁচা অপরিণত জীবন-পাত্রে এই মেয়েটার জীর্ণ যৌবনের ঝাঁঝালো মদ ঢেলে আকণ্ঠ পান করতে ছুটে এসেছে বলির বিল্বপত্রভোজী পশুর মতো। মেয়েটার হাত কাঁপছে অর্থাৎ সুরা কম্পন শুরু হয়েছে। চোখ দুটো সতত চঞ্চল করছে। বিড়বিড় করে বকছে। বমি করতে শুরু করলে বাসে। গৌহাটির যাত্রীরা আমাকে প্রচুর কমলালেবু দিয়েছিলেন। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছিল লেবুগুলির দিকে। আমি তাকে কয়েকটি লেবু দিয়েছিলাম। সে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কত দাম ? আমি হেসে বলেছিলাম—তোমাকে দিলাম, তুমি অসুস্থ, খাও। আমি তো লেবু বিক্রি করি না।

মেয়েটিকে একদিন ফুটপাতে পড়ে থাকতেও দেখেছি ; একটা জীপ এসে তুলে নিয়ে গেল।

মেয়েটির এই কয়েকটি কথা মনে হল সপ্তপদীর নায়কের আমূল পরিবর্তনের কথা মনে ক'রে। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না—সে বেরুল ঈশ্বর খুঁজতে, ঈশ্বর কি জানতে। রিনাই তো আঘাতের মধ্য দিয়ে দিলে তার ঈশ্বর... পেলে কি ? বৃহত্তর ঈশ্বর-বিশ্বাস, দৃঢ়তর বোধ পাওয়াই সম্ভব।

কিন্তু হারিয়ে রিক্ত হওয়াও তো অসম্ভব নয়।

ঈশ্বরের জন্য প্রিয়তম মানুষকে বর্জন করে। রিক্ততাই সাধারণভাবে মানবিক। পূর্ণতা অসাধারণ। অস্বাভাবিক না হলেও দুর্লভ। তাই মেয়েটির ওই সমুদ্রতীরের কথা মনে ক'রে এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির দুর্ধর্ষ বেপরোয়া দুঃসাহসের পথের দুর্মদেরা যে ভাবে পৃথিবীময় নিজেদের দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে সন্তান উৎপাদন ক'রে তাদের ফেলে চলে এসেছে এবং বর্ণসঙ্কর সমাজ বলে নিজের সন্তানদেরই ঘৃণা করে এসেছে সে-কথা মনে ক'রে ওই মেয়েটিকেই তার ওই

কয়েকটা কথার মধ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে রিনারূপে অঙ্কিত করেছি। জানি যে, মেয়েটার রক্তের মধ্যেই হয়তো পাপ-পুণ্য না-মানার ঈশ্বর না-মানার বীজ ছিল, হয়তো জন্ম-বৈরিণী, কিন্তু আমি তার কয়েকটা প্রদত্ত কথার মধ্যে একটা ব্যথা-বেদনার আভাস পেয়েছিলাম। কেবলমাত্র ওইটুকুর জন্যেই সে আমার মনে স্মরণী হয়ে আছে, তাই ওই ভাবেই সমবেদনার তর্পণের জল তাকে অর্পণ করে তাকে এঁকেছি আর বলেছি—আমি লেখক তুমি আমার কাছে এই তর্পণের তর্পণীয়া। তুমি আমার অনাকাঙ্ক্ষিত অঙ্কুর হয়তো বা অপঘাতই তোমার নিয়তি; তোমাকে তবু দিতে হবে আমার শ্রদ্ধার নির্মল জল। আমার শ্রদ্ধাতেই সে ফিরেছে। কুম্ভকোণমের কৃষ্ণস্বামীও যে আমার শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত।